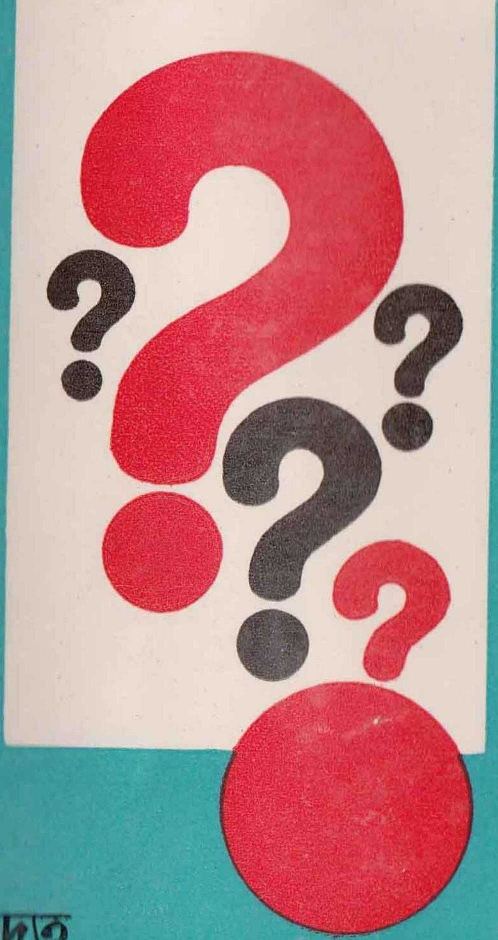

অজিত দত্ত

মানুষের ঠিকানা

দানিকেন তত্ত্বের আলোকে

লোকায়ত

মানুষের ঠিকানা

দানিকেনতত্ত্বের আলোকে

পিন্টু দাস
ক্রমিক সংখ্যা..........
....
তারিখ..........
ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার

অজিত দত্ত

লেখকের অনূদিত গ্রন্থাবলী

এরিখ ফন দানিকেনের

দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ?
নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন
বীজ ও মহাবিশ্ব
আমার পৃথিবী
আবির্ভাব
প্রমাণ
প্রাগিতিহাসের ঋষি
দেবতার গোধূলি বেলা
দেবতার চাতুর্য

য়োসেফ এফ ব্লুমরিশের

তখন স্বর্গ খুলিয়া গেল
কাস্কারা ও সপ্তবিশ্ব

সন্টু দাস
ক্রমিক সংখ্যা........
তারিখ........

আমাদের কথা

বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন পৃথিবী ও মহাকাশবিজ্ঞান সম্বন্ধে দানিকেনতত্ত্বের প্রচারক শ্রী অজিত দত্ত মহাশয়ের মৌলিক প্রবন্ধের কিছু সংকলন অবশেষে প্রকাশিত হলো। দানিকেনের বাঙালী পাঠকমহল তাঁর অনূদিত গ্রন্থগুলিকেই অনেক সময়েই ভুল করেন মৌলিক রচনা বলে। দানিকেনতত্ত্বের আলোকে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা-ধর্মী প্রবন্ধগুলো সমানভাবে উপভোগ করবেন পাঠকমহল, এই বিশ্বাসই আমরা পোষণ করি।

আপাত প্রচার-বিমুখ শ্রীদত্তের এই প্রবন্ধগুলো লেখার পেছনে একটা ছোট্ট ঘটনা রয়েছে। ঘটনাটির সূত্রপাত হলো, বেশ কিছুদিন আগে আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধের লেখক শ্রী দত্তের অনূদিত দানিকেনের বেশ কিছু লেখা আত্মসাৎ করে এবং কোথাও তার উল্লেখমাত্র না করে, নিজস্ব রচনা বলে প্রকাশ করেন। বিভাগীয় সম্পাদককে অবশ্য এ বিষয়ে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, কারণ প্রকাশিতব্য সমস্ত রচনা তাঁর পক্ষে খুঁটিয়ে পড়ে ছাপতে দেওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। কিন্তু অঘটন যা ঘটবার তা ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে। বেশ কিছু দানিকেন-অনুরাগীর নজরে পড়েছে প্রবন্ধের অংশগুলি, যা নাকি দানিকেনের বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ থেকে হুবহু নকল করে দেওয়া। ফলস্বরূপ প্রতিবাদের ঝড় উঠল সম্পাদকীয় কলমে। রবিবাসরীয় সম্পাদক ঝড় থামাতে অনুরোধ জানালেন শ্রীদত্তকে কিছু ধারাবাহিক রচনার জন্যে, বিষয় অবশ্যই দানিকেনতত্ত্ব! সেই শুরু হলো তাঁর মৌলিক রচনার জন্যে কলম ধরা। সেই ধারাকে অচল হতে দিলেন না শ্রীদত্তের একান্ত বন্ধু 'সমকালীন' পত্রিকার কর্ণধার শ্রী আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত মহাশয়। তাঁর ফরমায়েশ মাফিক রচিত হলো আরো বেশ কতক প্রবন্ধ।

এই বইতে সেই প্রবন্ধগুলো ছাড়াও আরও কয়েকটা প্রবন্ধ যুক্ত হয়েছে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার অনুরোধে সেগুলো লেখা। বইটি প্রকাশনার ব্যাপার সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছেন শ্রীদীপক ঘোষ মহাশয়। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। প্রচ্ছদ এঁকে দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রী বিশু গাঙ্গুলী।

দোলপূর্ণিমা, ১৩৮৮ — লোকায়ত প্রকাশনা

পাঠাগার.নেট

সূচীপত্র

গ্রহান্তরের মানুষ এসেছিল পৃথিবীতে?	৯
নভশ্চারণের আলোকে পুরাতন পুঁথি	১৫
নবযুগের আলোকে দেখা প্রত্নবস্তু	২৩
মাঝ আকাশের দেশ	৪০
প্রাচীন ভারতের প্রযুক্তি	৪৭
মানব-বিবর্তন	৫৪
আমার বয়স কত?	৬৩
পাতাল কোথায়	৭১
চাঁদের ওপিঠ	৭৮
অপরা ব্রহ্মাণ্ড	৮৪
কাল-শ্লথন	৯১

ক্রমিক সংখ্যা..........
তারিখ..........
ব্যক্তিগত গ্রন্থ

Pathagar.Net

গ্রহান্তরের মানুষ এসেছিল পৃথিবীতে?

গ্রহান্তরের মানুষ এসেছিল পৃথিবীতে? সারা পৃথিবীর আকাশে আজ এ প্রশ্ন ছড়িয়ে গেছে। এ প্রশ্ন যিনি প্রথম তুলেছেন, সেই সুইস্ প্রত্নবিদ্ ডঃ এরিখ ফন দানিকেনকে স্মরণ না করে এ প্রবন্ধের গোড়াপত্তন করা নেহাতই ধৃষ্টতা হবে। এ ভবে সুধন্য তাপস তিনি। দু'টো পুরাতন পুঁথি পাঠ করে অলস কল্পনার থীসিস লিখে সস্তা বাহবা তিনি চাননি। তাঁর মাতৃভাষা জার্মান এবং ফরাসী (ইংরেজীর জ্ঞানও তাঁর অবহেলার নয়) মারফত পুরাতন পুঁথিপত্রের জ্ঞান যতখানি আহরণ করা সম্ভব, ততখানি জ্ঞানের সম্পূর্ণ অধিকারী তিনি। তাছাড়া, তাঁর 'পাখা-লাগানো' পায়ে পৃথিবীর সর্বত্র উড়ে বেড়াচ্ছেন, ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রত্নস্থানসমূহের আনাচে-কানাচে, নিখুঁত করে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখছেন প্রত্যেকটি প্রত্নবস্তু, আজকের নভশ্চারণার যুগের চোখের আলোয় খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁর অপূর্ব অদ্ভুত বেয়াড়া প্রশ্নের সদুত্তর।

কে দেবে তাঁর প্রশ্নের জবাব? কেউ দেবে না। কোন মানুষের ক্ষমতা নেই তাঁর প্রশ্নের জবাব দেবার। কিন্তু কী দরকার তার? জবাব তো লেখা রয়েছে প্রত্নবস্তুর বুকে বুকে, পুঁথিপত্রের পাতায় পাতায়। যে ভাষায় সে জবাব লেখা আছে, সে ভাষায় আমাদের হাতেখড়ি হয়ে গেছে, যেদিন আমরা আকাশে উড়তে শিখেছি। বর্ণ পরিচয়ও হয়ে গেছে সেই দিন, যেদিন আমরা চাঁদের মাটিতে পাদচারণা শুরু করেছি।

কুবেরের পুষ্পক রথ যে আমাদের জেট বিমানের চেয়েও বহুগুণে উন্নত ছিল সে কথা বোঝাবার সাধ্য কৃত্তিবাসের ছিল না। বাল্মীকির 'হংসযুক্তেন' কথার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তাই বলে, সে অক্ষমতা তাঁর অগৌরব নয়। অগৌরব আমাদের ভাগ্যের। আমরা সব ভুলে গিয়েছিলুম। আমাদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, সব ঢাকা পড়ে গিয়েছিল বিস্মৃতির স্থূল আবরণে।

এমন বিস্মৃতি কেমন করে সম্ভব হল? এমন তো নয় যে কুরুক্ষেত্রের পারমাণবিক যুদ্ধে সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল? মরুভূমি হয়ে গিয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্র এবং তার আশেপাশে অবস্থিত সেকালের সভ্যতার সব ক'টি অঞ্চল? (প্রসঙ্গত বলি, পারমাণবিক বিস্ফোরণের তেজস্ক্রিয়তার বিষক্রিয়ার নানা ক্ষতির একটা হল স্মৃতিভ্রংশ)। তার বাইরের ভারত তো প্রায় বর্বর-অধ্যুষিতই ছিল। কুরুক্ষেত্র কি রাজস্থানের মরুভূমির নীচে? আমি জানি না।

সে সর্বনাশা যুদ্ধের পর যারা বেঁচেছিল তারা তো সব সশরীরে স্বর্গে গেল। সে কি গ্রহান্তরে? আরো যারা বেঁচেছিল, তারা আমাদেরই প্রপিতামহের দল। যুদ্ধের আঁচ তাদের গায়ে লাগেনি। বনে-জঙ্গলে কে কবে বোমা ফেলেছে? তারপর কেটে গেছে হাজার হাজার বছর। প্রকৃতি বসে থাকেননি, বিবর্তন আমাদের এগিয়ে নিয়ে এসেছে আবার আজকের এই উন্নত পর্যায়ে। অনন্ত স্মৃতির কোষাগারের কোটি কোটি কক্ষের কপাট খুলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। সব মনে পড়ছে একে একে। বলবিদ্যা থেকে শুরু করে অপেক্ষবাদ পর্যন্ত অনেক কিছু আজ টেনে বের করেছি স্মৃতির সেই সুগোপন কোষাগার থেকে।

দানিকেনের 'দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ?' আর 'নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন' পড়ে কোন কিছুকেই আর 'গাঁজা' বলে, অলীক কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে ভরসা পাই না। প্রায়ান্ধকার অতীতের কোন জ্ঞানকেই আজ আর জাদু বলে, আদিম কুসংস্কার বলে হেয় করতে পারি না, যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভারতের সব জ্ঞান, ভারতীয় সব ঐতিহ্যকে নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছি এতাবৎকাল, সেই পাশ্চাত্যেরই এক তরুণ পণ্ডিত শেখালেন, 'কোন কিছুকে নস্যাৎ কর না, ভেবে দেখ, খুঁজে দেখ, পেলেও পাইতে পার পরশরতন'।

বিবেকানন্দ বেঁচেছিলেন মাত্র সাড়ে উনচল্লিশ বছর। তারই ভেতরে সারা পৃথিবীর সমস্ত কর্ম, সমস্ত দর্শনে যে-ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন, তা বোধহয় পৃথিবীর কোন শিক্ষিত মানুষেরই অজানা নয়। কখন অত জ্ঞান আহরণ করবার সময় পেলেন তিনি? রামকৃষ্ণদেবই বা অতবড় দার্শনিক হলেন কী উপায়ে? বিবেকানন্দ তো তবু নামকরা ছাত্র ছিলেন, বি এ পাসও করেছিলেন। পরমহংসদেবের তো শুনেছি, বর্ণপরিচয়ও ছিল না, তা হলে? হেসে উড়িয়ে দেবেন না, আমাদের এক হঠযোগী বলেছিলেন, এক রকম যোগ-ব্যায়াম করলে নাকি 'কুলকুণ্ডলিনী' জাগ্রতা হন। অর্থাৎ, মেরুদণ্ডের নিম্নপ্রান্তে 'কিছু একটা' থাকে, বিশেষ সেই যোগ-ব্যায়ামটি করলে সেই 'কিছুটা' মেরুদণ্ড বেয়ে মগজে প্রবেশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী হয়ে ওঠে ব্যায়ামকারী। তবে কি পরমহংসদেব এবং স্বামীজী ওই ব্যায়াম করেই 'কুলকুণ্ডলিনী' জাগিয়েছিলেন?

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা বলছিলুম। সে সর্বনাশা যুদ্ধের পর কিছু মানুষ নিশ্চয়ই বেঁচে ছিল। বৃদ্ধ, শিশু, নারী তো বটেই। কোথায় ছিল তারা পারমাণবিক বিস্ফোরণের

মুহূর্তে? গুহার গভীরে কি? ভারতের কোথাও 'অ্যাটমিক বাংকার' নেই, কিন্তু গুহা আছে অগুণতি। সে সব গুহার বেশির ভাগই মানুষের হাতে তৈরি। দানিকেন তাঁর 'বীজ ও মহাবিশ্ব' গ্রন্থে এক জায়গায় বলেছেন, 'মালাবার উপকূলের কানহেরিতে অবস্থিত গুহাশ্রেণী মানুষের হাতে কাটা। প্রকৃতির দান নয় সে গুহাশ্রেণী'। সে সব গুহা নাকি জৈনদের। এই 'জৈন' শব্দটাকে 'বিজেতা' অর্থে ধরলে অনেক কথা পরিষ্কার হয়ে যায়। 'দেব সন্তান' পাণ্ডবরা (দেব সন্তানদের জনকরা যে স্বর্গের অধিবাসী ছিলেন, সে কথা মহাভারতেই পড়েছি।) মানব-সন্তান কৌরবদের যুদ্ধে পরাজিত করেছিল। তারপর, আগে কাটা গুহাশ্রেণীতে আশ্রয় নিয়েছিল, মিলিত হয়েছিল পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে। তারা নিশ্চয়ই জানতো গুহার গভীরে পারমাণবিক বিস্ফোরণজনিত তেজস্ক্রিয়তা পৌঁছোয় না। পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার জানলে তেজস্ক্রিয়তা থেকে বাঁচবার উপায়ও যে জানতেই হবে। গুহাবাসের কালে চিত্তবিনোদনের প্রয়োজনেই হয়তো গুহাপ্রাচীর অলঙ্কৃত করেছিল তারা, ছবি এঁকেছিল তাদের অপটু হাতে, কিছু বা পটু হাতও ছিল হয়তো।

বিশাল বিশাল গুহাশ্রেণী যারা কেটেছিল, পাহাড় কেটে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির কি তারাই গড়েছিল? মন্দিরে মন্দিরে গর্ভগৃহই বা কোন্ কম্মে তৈরী করেছিল? দেবমূর্তি স্থাপনের জন্যেই গর্ভগৃহের সৃষ্টি, একথা মানতে যেন মন চায় না। গর্ভগৃহগুলো গোপন গ্রন্থাগার ছিল না তো? কিংবা রত্নাগার? দু'টো সম্ভাবনার কোনটাকেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

গ্র্যানিট কেটে তৈরী ওই গুহাশ্রেণী জৈন-বিহারের প্রয়োজনে যে তৈরী হয়নি তা একটু ভাবলেই বোঝা যায়। জৈনধর্মের জন্মের অনেক অনেক আগেই ওই সুড়ঙ্গশ্রেণী তৈরী হয়নি কি? অজন্তার চিত্রকলার বয়স হয়তো হাজার দু'য়েক বছর, কিন্তু অজন্তা গুহার বয়স? সে কি ওই অপূর্ব চিত্রশিল্পের সমসাময়িক?

কিছুদিন আগে এক পত্রিকায় পড়লুম, মধ্যপ্রদেশের ভূপালের কাছে বিশাল এক সুড়ঙ্গশ্রেণী আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানেও রয়েছে অদ্ভুত সুন্দর চিত্রশিল্প। শুনতে পাই, বেশির ভাগ গুহাচিত্র নাকি 'ক্রোমানিয়ন' মানুষের আঁকা। তারা তো জানি, নিজের দেহই ভালো করে ঢাকতে শেখেনি, সভ্যতার বর্ণপরিচয়ও তো তাদের হয়নি। আঁকি-বুকি নয়, সুসমঞ্জস চিত্রশিল্প যে সভ্যতার বেশ উচ্চ পর্যায়ের দান। সে কথা থাক। গুহাগুলোর ভেতর কি আলো জ্বালানো হত? ক্রোমানিয়ন মানুষ তো বীজ নিংড়ে তেল বের করতে শেখেনি। তারা হয়তো চর্বি জ্বালিয়েছে আলোর প্রয়োজন মেটাতে।

কিন্তু মজা এই যে, পৃথিবীর কোথাও, কোন গুহাতেই, ভুসোর চিহ্নমাত্র নেই। চর্বির প্রদীপ জ্বাললেও ভুসো পড়বে, তেলের প্রদীপ জ্বাললেও ভুসো পড়বে। তাছাড়া, তেল বা চর্বির প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় তো রঙই চেনা যাবে না, অজন্তার শিল্পসৃষ্টি তো দূরস্থান। প্রত্নবিদ্ বলেন, বাইরে সূর্যের আলোয় রং চিনে নিয়ে প্রদীপের আলোয় তুলি বুলোতেন গুহাশিল্পীরা— আজ উপযুক্ত যুক্তি-প্রমাণের অভাবে এই কথাগুলোকেই চোখ-কান বুজে আমাদের গিলতে হচ্ছে।

যাইহোক, নিছক বাস করার প্রয়োজনে সুড়ঙ্গ কাটা হয়নি। গুহা তৈরী হয়েছে, যুদ্ধকালীন নিরাপত্তার কারণে। শীতপ্রধান দেশে গুহার গভীরে গরমে বাস করা সম্ভব হলেও হতে পারে, কিন্তু গরম দেশে গুহার গরমে বাস করা বোধহয় কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। তারপর, শ্বাসকার্য চালাবার উপযুক্ত অক্সিজেনই বা কোথায় গুহার গভীরে? আমি মশাই, গবেষক নই। গবেষকদের মতন চওড়া ফুসফুসও নেই আমার। আমি একবার একটা গুহায় নেবেছিলুম। কিন্তু, পনেরো-বিশ ফুট মাত্র নেবেই দম নেবার জন্যে ছটফট করেছি, পালিয়ে আসতে পথ পাইনি।

অনেক সময়েই পণ্ডিতদের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারি না। একদিন দানিকেন নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, যাঁর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল তিনি ভাষাতত্ত্বের এক 'ডাক্তার'। কথায় কথায় ভাষার কথা উঠলো, বললেন, ভারতীয় প্রায় সমস্ত ভাষার জন্ম সংস্কৃত ভাষা থেকে। আমি একটা সাধারণ মুখ্যু মানুষ বলে বললুম, 'তা কেমন করে হবে? ভাষাটার নামই যে সংস্কৃত, সংস্কার করে যা দাঁড়িয়েছে, ওটা তাই। তিনি বেশ একটা উচ্চ পর্যায়ের হাসি হেসে বললেন, 'সত্যিই কিন্তু তা নয়।' আমি সাধারণ মানুষ, স্বভাবতঃই 'এঁড়ে তক্কো' করতে আমি পটু। বললুম, ''লেখার ভাষা আর মুখের ভাষার তফাত থাকবেই, বাংলা ক্লাসিক সাহিত্যের দিকে নজর করলেই তা বোঝা যায়। আসল সংস্কৃত ভাষাটা সেকালের সাহিত্যের ভাষা। আর, আদত ভাষা, আদি ভাষা মূর্খের ভাষা হল ওই 'হলা শউন্দলে'— 'হ্যাঁলা শকুন্তলা'।'' ডাক্তার হো হো করে হেসে উঠলেন। আমার বিদ্যের বেলুনে ছুঁচ বিঁধলো, একেবারে চুপসে গেলুম। 'তাবৎ শোভতে' ঋষিবাক্যটা মনে পড়ে গেল, আর কথা বলতে পারলুম না। সংশয় কিন্তু আজো আমার মন-ছাড়া হয়নি। মনের সংশয় মনেই চেপে রাখি, পণ্ডিতী ব্যাখ্যাকে ভুল বলে তর্কে আহ্বান করবার মত বিদ্যে আমার নেই।

পুঁথিপত্রের কদর আমাদের দেশে দুয়োরানীর মত। শিক্ষার আমাদের এমনই গুণ যে রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, পুরাণে যা কিছু লেখা আছে, ভাবি, সবই তার অলীক

কল্পনা, নেহাতই গপ্পো, না হয়, বড় জোর নীতিশিক্ষা। আমাদের দেশে অর্থবান লোকের অভাব নেই, উৎসাহী লোকও যে নেই, তা নয়, কিন্তু উৎসাহী অর্থবান লোক একটিও নেই। হাইনরিশ্ শ্লীমান্ একটাও জন্মায়নি এ পোড়া দেশে।

রামায়ণের কুম্ভকর্ণ একটি বিচিত্র চরিত্র। বাল্মীকি তাকে 'যন্ত্র' বলে কেন অভিহিত করলেন? অঙ্গদের জবানিতে কেন বললেন, 'এ রাক্ষসের যুদ্ধ করবার ক্ষমতা নেই, এ একটা ভীষণ বিভীষিকা মাত্র'? বিভীষণকে দিয়েই বা তিনি কেন বলালেন, 'যন্ত্রমেতৎ সমুচ্ছ্রিতম্'? সত্যিই যদি দেহ তার রক্তমাংসে গড়া হত, তাহলে কি বাল্মীকি তাকে 'যন্ত্র' অভিধা দিতে পারতেন? এমন তো হতে পারে, কুম্ভকর্ণ আসলে ছিল একটা প্রকাণ্ড রোবট? তার ধরন-ধারণ দেখে সত্যিই মনে হয়, বাল্মীকি কুম্ভকর্ণ নামে একটা রোবটের কথাই বলেছেন।

'সমরাঙ্গন সূত্রধারা' নিয়েও আমরা কোনদিন মাথা ঘামাইনি। এতরকম বিমানের বিবরণ তাতে আছে যে, আজকের দিনের বিমান পরিকল্পকদের তা ঈর্ষার বস্তু হতে পারে। পুঁথির লেখক বলেছেন, বিমানের ইঞ্জিন থাকতো তার লেজের দিকে। সেখানে 'পারা পুড়িয়ে' প্রচালন-শক্তি সৃষ্টি করা হত। সেই শক্তির সাহায্যে বিমান চলতো সামনে, পেছনে, ওপরে, নিচে। এও কি অবাস্তব কল্পনা? ভেবে দেখুন, পারাকে চালকশক্তি হিসেবে ব্যবহার করতে পারলে বিমানে কত বেশি জায়গা পাওয়া যাবে। পেট্রলের ট্যাঙ্ক কতখানি জায়গা জুড়ে থাকে তা অনেকেই জানেন। আর পেট্রল ব্যবহারে বিপদের ঝুঁকিটাই কি কম? যাই হোক, সেই 'সমরাঙ্গন সূত্রধারা'র দিকে আমাদের নজর পড়েছে এই সেদিন, সেদিন শুনলুম, পশ্চিম জার্মানীর বিজ্ঞানীরা পারাকে পেট্রলের পরিবর্ত হিসেবে ব্যবহার করবার উদ্দেশ্যে গবেষণা শুরু করেছেন।

আমাদের কোন কিছুকেই আমরা বিশ্বাস করি না, যাচাই করেও দেখতে চাই না, যতক্ষণ না পশ্চিম সেই 'কোন কিছু'র সমার্থক 'কিছু' বলছে। ভৃগু বলেছেন, পৃথিবীতে আত্মার চরমতম সংখ্যা ছ'শ কোটি, জন্ম-মৃত্যুর আবর্তনে তারাই ঘুরে ঘুরে আসবে-যাবে। আমরা মানিনি সে কথা। জ্যোতিষীরা সে কথা শোনালে, গাঁজা' বলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান যখন বললে, পৃথিবীর চরমতম সম্ভাব্য জনসংখ্যা ওই ছ'শ কোটি তখন মাথা পেতে মেনে নিলুম। বললুম, ও কথার ভিত্তি যে বিজ্ঞান। আর, ভৃগুর কথা? কাকতালীয়?!

সারা পৃথিবীর পুঁথিপত্রে, কাহিনী-কিম্বদন্তিতে বলে, যাবতীয় মহৎকর্মের স্রষ্টা

'দেবতা'। কে সেই দেবতা? সে দেবতা স্বর্গের অধিবাসী। কোথায় সে স্বর্গ? না, পৃথিবীর কোথাও নয়। সে স্বর্গ আকাশে। সে দেবতা বারে বারে নেবে এসেছেন আকাশ থেকে, মেঘ-গম্ভীরনিস্বন স্যন্দনে। কোন্ সূর্যের, কোন্ গ্রহে আমাদের সেই স্বর্গ? এ সব প্রশ্নের জবাব আজও মেলেনি। তবে, এও বুঝতে পারছি, সে জবাব পেতেও আর বেশি দেরি নেই।

এই সেদিন আবিষ্কৃত হয়েছে পেরু আর ইকোয়েডরের মাটির নিচে প্রকাণ্ড এক গ্রন্থাগার। হাজার হাজার সোনার পাতে লেখা সেই অসংখ্য গ্রন্থরাজি। সে গ্রন্থাবলীর লেখকদের, সে মহাসভ্যতার জনকদের ঠিকানা বের করতে আর বেশি দেরি হবে না। অমৃতের পুত্র আমরা, দেবতার সন্তান আমরা, অমৃতের সন্ধান, অমর্ত্যলোকবাসী পিতার সন্ধান কি আমরা না পেয়ে পারি?

Pathagar.Net

নভশ্চারণের আলোকে পুরাতন পুঁথি

'আমি যখন কবার নদীতীরে নির্বাসিত লোকদের মধ্যে ছিলাম, তখন স্বর্গ খুলিয়া গেল। আর আমি ঈশ্বরীয় দর্শন প্রাপ্ত হইলাম। ...আমি দৃষ্টি করিলাম, আর দেখ, উত্তরদিক হইতে ঘূর্ণবায়ু, বৃহৎ মেঘ ও জাজ্বল্যমান অগ্নি আসিল, এবং তাহার চারিদিকে তেজ ও তাহার মধ্য স্থানে অগ্নির মধ্যবর্তী প্রতপ্ত ধাতুর ন্যায় প্রভা ছিল। আর তাহার মধ্য হইতে চারি প্রাণীর মূর্তি প্রকাশ পাইল। তাহাদের আকৃতি এই, তাহাদের রূপ মনুষ্যবৎ। আর প্রত্যেকের চারি চারি মুখ ও চারি চারি পক্ষ। তাহাদের চরণ সোজা, পদতল গোবৎসের পদতলের ন্যায়, এবং তাহারা পরিষ্কৃত পিত্তলের ন্যায় চাকচিক্যশালী। ...আমি যখন ওই প্রাণীদিগকে অবলোকন করিলাম, দেখ ভূতলে ওই প্রাণীদের পার্শ্বে চারি মুখের এক একটির জন্য এক এক চক্র ছিল। চারি চক্রের আভা ও রচনা বৈদুর্যমণির প্রভার ন্যায়, চারিটির রূপ একই, এবং তাহাদের আভা ও রচনা চক্রের মধ্যস্থিত চক্রের ন্যায় ছিল। গমনকালে ওই চারি চক্র চারি পার্শ্বে গমন করিত, গমনকালে ফিরিত না। তাহাদের নেমি উচ্চ ও ভয়ঙ্কর, এবং সেই চারিটি নেমির চারিদিক চক্ষুতে পরিপূর্ণ ছিল। আর প্রাণিগণের গমনকালে তাহাদের পার্শ্বে ওই চক্রগুলিও গমন করিত, এবং প্রাণিগণের ভূতল হইতে উত্থাপিত হইবার সময়ে চক্রগুলিও উত্থাপিত হইত।'

বাইবেল এ-দর্শনকে বলে দিব্যদর্শন। আধুনিক বিজ্ঞানী বলেন, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। য়োসেফ্ ব্লুমরিশ্ 'দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ?' গ্রন্থে বাইবেলের ওই উদ্ধৃতি পড়েই দানিকেনকে নস্যাৎ করতে, নিশ্চিহ্ন করতে গিয়ে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করে বসলেন। সে অন্য কথা। তিনি বললেন, ইজেকিয়েলের প্রতিবেদন প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন। যে আকাশযানের বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তাতে যে ধরনের প্রযুক্তিগত কৌশল বর্তমান ছিল, সে প্রাযুক্তিক পর্যায়ে পৌঁছতে আধুনিক মানুষের আরো দু'চার কুড়ি বছর লাগবে।— আকাশযানটি যেমনই হোক, তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা বিশেষ নেই, কিন্তু সে বিমানে কারা এসেছিলেন? ভিনগ্রহবাসী নভশ্চর ন'ন কি তাঁরা?

'সমরাঙ্গন সূত্রধারা'য় বর্ণিত বিমানগুলো যদি ইজেকিয়েলের কালে আকাশে আকাশে ছুটে বেড়াতো, তাহলে তো তাঁর অমন আশ্চর্য হবার কথা নয়। বড় জোর উড়ন্ত বিমানকে মাটিতে নামতে দেখার যে বিস্ময়, সেইটুকুই প্রকাশ পেত, তার বেশি নয়।

বাইবেলে বলা হয়েছে, ইজেকিয়েলের দেখাটা ঠিক দেখা নয়, কতকটা দিব্যদর্শন গোছের ব্যাপার, কেননা, ধরে নেওয়া হয়েছে, তিনি ঈশ্বরের দর্শন লাভ করেছিলেন। ঈশ্বরকে তো সাদা চোখে দেখা যায় না, দিব্যদৃষ্টি দিয়েই দেখতে হয়। তাই সেটা দিব্যদর্শন। কিন্তু সেটা যে কতখানি বাস্তব দর্শন, সে কথা বোঝাবার ক্ষমতা বাইবেলের লিপিকারের ছিল না। বোঝাবার মত প্রাযুক্তিক উন্নতি এবং, সেইসঙ্গে মানসিক উন্নতিও তখন হয়নি। সে কথা বোঝবার অবস্থা আজ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ব্লুম্‌রিশের কথা আর একটু বলবার আছে। য়োসেফ্ ব্লুম্‌রিশ্ (নাসার— NASA— মহাকাশ স্টেশন প্রকল্পের খোদ কর্তা) দানিকেনের বইএ ইজেকিয়েলের প্রতিবেদন পড়ে ভাবলেন, তাঁর ইজেকিয়েল ব্যাখ্যা, ছোট কল্কেয় বেশ খানিকটা দম দেবার পরেই বেরিয়েছে, তার আগে নয়। তাই তাঁকে একেবারে শেষ করে দেবার মতলবে বাইবেলখানা বের করে পড়া নয়, একেবারে গবেষণা শুরু করে দিলেন। তাঁর এলাকায় নাক গলানোর মজাটা ভালো করেই টের পাইয়ে দেবেন যে। কিন্তু ব্লুম্‌রিশের গবেষণার ফল? অদ্ভুত! নিজেই একখানা বই লিখে বসলেন, বললেন, ইজেকিয়েলের বর্ণনা শুধু চাক্ষুষ বর্ণনা নয়, তাঁর দেখা মহাকাশযানটি তৈরি করতে আজকের মানুষের এখনো বেশ কয়েক কুড়ি বছর লাগবে। (দানিকেনের তৃতীয় গ্রন্থ, বীজ ও মহাবিশ্ব থেকে।)

ভারতীয় পুরাণ ইত্যাদিতে এ ধরনের যত কথা আছে, এ স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে তো সব উল্লেখ করা নেহাতই অসম্ভব। সবচেয়ে বড় দুঃখের কথা, আমাদের কোন কিছু নিয়েই আমরা কোনদিন মাথা ঘামাইনি। পশ্চিম দয়া করে যেটুকু করেছে, শুধু সেইটুকু নিয়েই আমরা মাতামাতি করেছি। ওই পর্যন্তই, তার বেশি একটুও নয়। আমাদের একজন পণ্ডিতও এদিকে নজর দেননি।

বাইবেলের 'দেবতা' তথা নভশ্চর বারেবারে এসেছেন পৃথিবীতে। 'আপন সাদৃশ্যে' মানুষ (homo sapiens) সৃষ্টি করে, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করে ফিরে গিয়েছিলেন আপন গ্রহে। তারপর আবার এসেছেন ফিরে, আপন সৃষ্টির পরিণতি পর্যবেক্ষণ করতে। বেছে বেছে ভালো ভালো নমুনাগুলোকে রেখে বাকিগুলোকে হয় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন, নয় তো অন্য কোনখানে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন। বাছা বাছা মানবীর গর্ভে দিয়েছেন সন্তান, বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করবার মানসে।— মানবীর গর্ভে দেবসন্তানের নজির পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন পুঁথিতেই পাওয়া যাবে। ভারতে তো এ নজির ভুরিভুরি।

প্রাচীন পুঁথির ধর্মীয় ব্যাখ্যা ছাড়া, বাস্তব ব্যাখ্যা বোধ হয় খুব কমই দেওয়া হয়েছে। বেদের কথাই ধরা যাক। ওই গ্রন্থচতুষ্টয়ের 'বেদ' আখ্যা, মনে হয়, ব্যাসদেবের অনেক আগের কালেই দেওয়া হয়েছে। বেদের সঙ্কলক বলেই ব্যাসদেবকে বেদব্যাস বলা হয়। 'বেদ' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান' হওয়া সত্ত্বেও, সাধারণ ভাবে বলে থাকি, বেদ নাকি যাগ-যজ্ঞ-যাদুর মন্ত্রসমষ্টি। যারা অঙ্কশাস্ত্রে, জ্যোতিষশাস্ত্রে এত ব্যুৎপন্ন ছিল, তারা যাগ-যজ্ঞ-যাদুমন্ত্রকে 'জ্ঞানভাণ্ডার' আখ্যা দেবে, এটা কি মানবার মত কথা? হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যাখ্যাটি বিংশ শতাব্দীতেও চালু। তাঁর কথাই উদ্ধৃত করি,— "তাঁহারা (ঋগ্‌বেদের কবিরা) কেবল হৃদয়ের গভীর ভাব, ভয়, ভক্তি, স্নেহ, আশঙ্কা, আশা, ভরসা ইত্যাদি মাত্র প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। কিন্তু সেই ভাব ব্যক্ত তাঁহারা কি রূপে করিয়াছেন? সে ভাব প্রকাশে চাতুরী নাই, শ্রম নাই, চিন্তা নাই। কোন ভাব, ভয়, কি ভক্তি মনে উদয় মাত্রেই তাহা সমস্ত অন্তর অধিকার করিয়াছে, আর অমনি তাহা বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সে বাক্য সরল, প্রাঞ্জল ও মহীয়ান্ ভাবও সরল, প্রাঞ্জল ও মহীয়ান অলঙ্কারের দোষ, পরিচ্ছদের ভয় নাই, সুরুচি, কুরুচি চিন্তা নাই, আর পাঁচজনকে ভুলাইবার জন্য ভাব প্রকাশের চাতুরী নাই।...সেকালে তাঁহারা যাহা দেখিতেন, তাহাই তাঁহাদের কাছে প্রকাণ্ড, তাহাই সুন্দর ও তাহাই নূতন। আমরা আজি হিমালয় পর্বত দেখিয়া যেরূপ প্রকাণ্ড বলিয়া আনন্দিত হই, তাঁহারা সামান্য পর্বতমালা দেখিয়া তাহা অপেক্ষা শতগুণে আনন্দিত হইতেন।"—এই পর্যন্তই থাক। এবার ঋগ্‌বেদ থেকে বেশি নয়, দু'একটা সূক্ত উদ্ধৃত করে দেখা যাক শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যাখ্যা কতখানি যুক্তিগ্রাহ্য।

"দেবতাদিগের জন্মবৃত্তান্ত সুস্পষ্টরূপে কহা যাইতেছে। দেবতারা উৎপন্ন হইবার পূর্বকালে ব্রহ্মণস্পতি নামক দেব কর্মকারের ন্যায় দেবতাদিগকে নির্মাণ করিলেন। অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হইল। দেবোৎপত্তির পূর্বতন কালে, অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হইল। পরে উত্তানপদ হইতে দিক্ সকল জন্ম গ্রহণ করিল। উত্তানপদ হইতে পৃথিবী জন্মিল, পৃথিবী হইতে দিক সকল জন্মিল, অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ হইতে আবার অদিতি জন্মিলেন। হে রক্ষ, অদিতি যে জন্মিলেন, তিনি তোমার কন্যা, তাঁহার পশ্চাৎ দেবতারা জন্মিলেন, ইঁহারা কল্যাণমূর্তি ও অবিনাশী।" (ঋগ্‌বেদ, রমেশচন্দ্র দত্ত—১০।৭২ঃ ১-৫)।

"যিনি আমাদিগের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্বভুবনের সকল ধাম

অবগত আছেন, যিনি একমাত্র, অথচ সকল দেবের নাম ধারণ করেন, অন্য তাবৎ ভুবনের লোক তাঁহার বিষয়ে জিজ্ঞাসাযুক্ত হয়।... যিনি ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে তোমরা বুঝিতে পার না, তোমাদিগের অন্তঃকরণ তাহা বুঝিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই, কুজ্‌ঝটিকাতে আচ্ছন্ন হইয়া লোকে নানা প্রকার জল্পনা করে, তাহারা আপন প্রাণের তৃপ্তির জন্য আহারাদি করে এবং স্তব-স্তুতি উচ্চারণ করতঃ বিচরণ করে।" (ঋগ্‌বেদ, রমেশচন্দ্র দত্ত—১০।৮২)।

"তৎকালে যাহা নাই, তাহাও ছিল না, যাহা আছে, তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতিদূর বিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল! তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যাতিরেকে আত্মামাত্রা অবলম্বনে নিশ্বাসপ্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। সমস্তই চিহ্ন-বর্জিত ও চতুর্দিক জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন। সর্বপ্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে সর্বপ্রথম উৎপত্তিকারণ নির্গত হইল। বুদ্ধিমান্‌গণ বুদ্ধিদ্বারা আপন হৃদয়ে পর্যালোচনাপূর্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তিস্থান নিরূপণ করিলেন। রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভব হইলেন, মহিমাসকল উদ্ভব হইলেন। উহাদিগের রশ্মি দুই পার্শ্বে ও নিম্নের দিকে এবং ঊর্ধ্ব দিকে বিস্তারিত হইল, নিম্নদিকে স্বধা রহিল, প্রয়তি ঊর্ধ্বদিকে রহিলেন।"— (ঋগ্বেদ, রমেশচন্দ্র দত্ত) ১০।১২৯)।

এগুলো কি আদিম সরল মানুষের সরল বিশ্বাসপ্রসূত বলে মনে হয়? আজকের দিনের উন্নতমানের বিজ্ঞানী কিংবা দার্শনিকের পক্ষেও কি এমন উক্তি করা সহসা সম্ভব? আর একটা উদাহরণ দিই।

জগদ্‌গুরু স্বামী ভারতী কৃষ্ণ তীর্থ শংকরাচার্য ((গোবর্ধনপীঠ, পুরী) বেদ নিয়ে গবেষণা করতে করতে হঠাৎ অঙ্কশাস্ত্রের এক বিরাট আবিষ্কার করেছিলেন। ষোলটি সূত্রের সাহায্যে সুবিশাল অঙ্কশাস্ত্র বাঁধা। সে সূত্রগুলির এমনি গুণ যে সব অঙ্কই মুখে মুখে করে দেওয়া যায়। জগদ্‌গুরু বলেছেন, যে অঙ্কশাস্ত্র আয়ত্ত করতে আধুনিক পদ্ধতি মারফত লাগে ১৫ থেকে ২০ বছর সময়, সেই অঙ্কশাস্ত্রই বৈদিক পদ্ধতিতে আয়ত্ত করতে লাগে, দৈনিক ২।৩ ঘণ্টা খেটে মাত্র ৮ থেকে ১২ মাস সময়। এ উক্তিতে যে ছোট কল্পের প্রভাব নেই, তা তাঁর বইখানি ওল্টালেই বুঝতে পারা যাবে।

সন্দেহ নিরসনার্থে বলি, তাঁরই বইএর নাম, Vedic Mathematics প্রকাশক, Benares Hindu University।

অথর্ব বেদের চারটে উপবেদ আছে, তাদের নাম, গান্ধর্ববেদ, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ আর স্থাপত্যবেদ। অঙ্কশাস্ত্রের সূত্র আছে শেষোক্ত বেদটিতে। জগদ্‌গুরুর সন্দেহ হয়েছিল, 'বেদ' যার নাম, সে শুধু মন্ত্র-তন্ত্রের সংকলন কেন হবে? সত্যিকার বিশ্লেষণী মনে যখন প্রশ্ন জাগে, উত্তর তার নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসে। জগদ্‌গুরুও তাঁর প্রশ্নের জবাব পেয়েছিলেন।

সুইস্ পণ্ডিত, এরিখ ফন দানিকেন দেখিয়ে না দিলে জানতেই পারতুম না, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু আমাদের পণ্ডিতরা পুঁথিপত্রের বয়েস নিয়েই মাথা রগড়াচ্ছেন। কী হবে তাদের বয়স নিয়ে, যদি তাদের বস্তুর খোঁজই না পাওয়া গেল! কত প্রযুক্তিক কৌশল 'দেবতারা' রেখে গেছেন আমাদের জন্যে, তার খোঁজ করা কি এমনই অর্থহীন? আমাদের পিতৃপুরুষের উইলে যদি মিথ্যে করেও লেখা থাকে যে ছোট বাগানের ঈশান কোণে এক ঘড়া মোহর লুকোন আছে, তাকে খুঁজে বের করতে তো প্রাণপাত করি, দশটা দিকের ন'টাকেই চষে ফেলি। অথচ এত বড় উত্তরাধিকার যে লুকোন রয়েছে এখানে, তাকে খুঁজে বের করতে কি নখের আঁচড়টাও দেবো না?

তিব্বতী 'ধ্যান' পুঁথিতে যে সৃষ্টি-তত্ত্বের কথা আছে, হেলীন পেত্রোভ্‌না ব্লাভাৎস্কী যা খুঁজে বের করেছেন, তাকেও তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করিনি কোনদিন। দানিকেনের 'নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন' থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, দেখুন তাতে কী জ্ঞান লুকোন রয়েছে, দেখুন, যাদের আমরা আদিম বলে মুখ ফিরিয়ে থাকি, তাদের জ্ঞানের বহরটা।—

প্রথম স্তবক—

কাল ছিল অনঙ্কুরিত। অনন্ত স্থিতির বক্ষে সুপ্ত ছিল মহাকাল...অনাদি অসীম অবগুণ্ঠিত ছিল নিশ্ছিদ্র তমসায়...বিশ্বের ব্যাপ্তির অন্তরে জীবন স্পন্দিত ছিল আপন অজ্ঞাতে।...সপ্ত মহেশ্বর এবং সপ্ত সত্য ছিল অবিদ্যমান...

দ্বিতীয় স্তবক—

...কোথায় ছিলেন স্রষ্টাবৃন্দ, সেই জ্যোতির্ময় পুত্রগণ...বিশ্বেব মূলস্বরূপ যে বিমূর্ত পরব্রহ্ম, সেই বিমূর্তকে রূপদান করিলেন যে স্রষ্টাগণ, কোথায় ছিলেন তাঁহারা?... কালের পদধ্বনি তখনো শ্রুত হয় নাই, তখনো বীজে কিরণপাত ঘটে নাই...

তৃতীয় স্তবক—

...সপ্তম অনন্তের শেষ স্পন্দন সীমাহীন অন্তরীক্ষের দিকে দিকে স্ফুরিত হইতেছে...সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বহিয়া চলিয়াছে দ্রুতপক্ষ স্পন্দন, বহিয়া লইয়া চলিয়াছে ধ্বান্তের সেই বীজকে। সে তমিস্রা শ্বসমান ছিল নিদ্রামগ্ন জীবন সলিলে...অমৃত পয়োধির বিন্দুতে বিন্দুতে নিহিত ছিল জীবনের মূল। সে অমর্ত্য সমুদ্র, উজ্জ্বল আলোক-বন্যা,— উত্তাপ, অগ্নি ও গতি যাহার স্বরূপ। অন্ধকার বিদুরিত হইল, আলোকোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল সর্ব চরাচর। ...সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল তমসাচ্ছন্ন আকাশপ্রসূত আলোয় আলোকময় নভোঅঙ্গন...সূর্যসম জ্যোতির্ময় তিনি, দিব্যজ্ঞানের জ্বলন্ত বহ্নিবর্তিকা তিনি।...কোথায় ছিল আদিশক্তি? কোথায় হারালো তমিস্রা?...উহাই সেই আদিশক্তি, উহাই আলোক, ঘনতমসাচ্ছন্ন পিতার দীপ্তিমান, জ্যোতির্ময় সন্তান।

চতুর্থ স্তবক—

শৃন্বন্তু, হে পৃথ্বীপুত্রগণ, অবধান কর, তোমাদিগের গুরু, জাতবেদাগণের বাণী...আলোক বিচ্ছুরণ হইতে...চিরান্ধকারের গর্ভলীন রশ্মি হইতে...অনন্ত আকাশে উত্থিত হইল পুনরুজ্জীবিত শক্তিসমূহ...তদনন্তর সেই মহাত্মা হইতে আবির্ভূত হইল রূপ, প্রস্ফুটিত হইল জ্যোতিঃ, প্রকাশিত হইল পবিত্র জীবসমূহ, উদ্ভূত হইল পুণ্যশ্লোক পিতৃপুরুষের বাণীবাহী দূতবৃন্দ...

পঞ্চম স্তবক—

...জ্ঞানবহ্নির পবিত্র ঘূর্ণমান আদি নিশ্বাস সপ্তক অতঃপর সৃজন করিলেন বহ্নিমান ঘূর্ণিবাত্যা...অমৃতের পুত্রগণের ক্ষিপ্রগতি সন্তান...বার্তা বহন করিতে লাগিলেন সর্বচরাচর ব্যাপিকা...তড়িল্লতার ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন অগ্নিগর্ভ মেঘমালা ভেদ করিয়া...তিনিই তাহাদিগের নেতা, পথিকৃৎ তিনি। কর্মের শুভ সূচনায় তিনি বিচ্ছিন্ন করিলেন অধোলোকের অগ্নিকণা সমূহকে, সঞ্চরণশীল যে বহ্নিকণা আপন দীপ্তভুবনে থাকে আনন্দ শিহরণে স্পন্দমান...

ষষ্ঠ স্তবক—

...বেগবান, জ্যোতির্ময় তিনি...ব্রহ্মাণ্ডকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন শাশ্বত ভিত্তিভূমি পরে...পুরাতন চক্রের আকারে নির্মাণ করিয়া নীহারিকাপুঞ্জকে তিনি স্থাপন করিলেন অবিনশ্বর চক্রনাভিতে...কি রূপে তাহাদিগকে নির্মাণ করিলেন বিশ্বকর্মা? প্রজ্জ্বলিত কণাসমূহকে আহরণ করিয়া পরিণত করিলেন অগ্নিগোলকে। অতঃপর তাহাদিগের

অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন তাহাদের অন্তরে, গতি দান করিলেন, তাহাদিগকে...তাহারা শীতল, তিনি তাহাদিগকে আতপ্ত করিলেন। তাহারা শুষ্ক, তাহাদিগকে আর্দ্র করিলেন তিনি। তাহারা দীপ্ত, উত্তপ্ত, ব্যজন করিয়া তিনি তাহাদিগকে ঈষৎ শীতল করিলেন। এবম্প্রকারে ত্বষ্টা সপ্ত অনন্তকাল ব্যাপিয়া সায়াহ্ন হইতে সায়াহ্নান্তরে কর্ম সম্পাদন করিয়া চলিলেন। ...আদি জননীর সন্তানে চরাচর পূর্ণ হইয়া গেল। স্রষ্টা এবং রুদ্র পরস্পর হইলেন সমরে লিপ্ত। অবস্থানের নির্মিত সে যুদ্ধ।

সপ্তম স্তবক—

...চেতন অরূপ জীবনের প্রথম প্রকাশ অবলোকন কর। আদিতে মাতৃসত্তা হইতে উদ্ভুত হইয়াছে সেই পরমসত্তা...সেই এক হইতে উন্মেষ ঘটিয়াছে ক্ষুদ্রতর বহুর...অতঃপর স্রষ্টাগণ আদি বসনে ভূষিত হইয়া অবতরণ করিলেন আলোকোদ্ভাসিত ধরণীতে, আধিপত্য করিতে লাগিলেন মনুষ্যগণের উপরে।— সে মনুষ্য তাঁহাদেরই একমেব অভিন্ন সত্তা।

শিক্ষিত পাঠকের কাছে এ সৃষ্টি-কাহিনীর টীকা নেহাতই নিষ্প্রয়োজন। আজকের এই নভশ্চারণের যুগে এ-কাহিনীর কী ব্যাখ্যা করা হবে? তবে, যে ব্যাখ্যাই করা হোক, 'ধর্ম'কে যে টানা হবে না, তা আমি হলফ করেই বলতে পারি। এহ বাহ্য। এ জিনিস কি আদিম মানুষের সরল উক্তি?

বিষ্ণু পুরাণের একটা গপ্পো শুনুন। রৈবত কুশস্থলী নামক রাজ্য ভোগ করতেন। কন্যা রেবতীকে কোন্ পাত্রে সম্প্রদান করা কর্তব্য জিজ্ঞাসা করতে মেয়েকে নিয়ে গেলেন ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মলোকে পিতামহ তখন গান্ধর্ব সঙ্গীত উপভোগ করছেন। সকন্যা রৈবতও বসে গেলেন। সঙ্গীত নিবৃত্ত হতে প্রণাম করে কন্যার উপযুক্ত বরের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। ব্রহ্মা একটু হেসে বললেন, যতটুকু সময় এখানে বসে গান শুনেছ, ততটুকু সময়ে পৃথিবীতে অনেকগুলি চতুর্যুগ পার হয়ে গেছে। তোমার রাজ্যও এখন অতীতের বস্তু। রাজার অবস্থাটা বুঝুন। ভয়ে ভয়ে বললেন, তাহলে কী করবো? পিতামহ বললেন, পৃথিবীতে তুমি যখন পৌঁছবে তখন কুশস্থলীর নাম হয়েছে দ্বারকা। তখন বলরাম সেখানে রাজত্ব করছেন। সংকর্ষণই তোমার মেয়ের উপযুক্ত বর।

রৈবত ভূতলে অবতরণ করলেন, দেখলেন, তাঁর কুশস্থলীর রূপ পাল্টে গেছে। গৌরবান্বিত রৈবতবংশও লোপ পেয়েছে। সমস্ত মানুষও দেহে এবং শক্তিতে অনেক

ছোট হয়ে গেছে।

এটা কি নিছক ঠাকুমার ঝুলি-ঝাড়া গপ্পো? এতাবৎ কাল কিন্তু তাইই মনে করেছি। একবার ভুলেও ভাবিনি, পুরাণকার কেমন করে জানলেন যে জাগতিক এবং মহাজাগতিক কালের মাঝে বিরাট একটা ফারাক আছে। আগে না হয় বুঝিনি, কিন্তু আইনস্টাইন বলে দেবার পরেও তো বোঝা উচিত ছিল। আরে রামো, কোথায় আইনস্টাইন আর কোথায় পুরাণকার।

আর একটা গপ্পো বলি। ত্বষ্টা, তথা বিশ্বকর্মার জামাই সূর্য। মেয়ের নাম সরণ্যু। সূর্যের তেজ তখন এত বেশি যে সরণ্যু স্বামীর সে-তেজ সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে গেল সমুদ্রের তলায়। তপস্যা শুরু করলো বাড়বাগ্নি রূপে। অনুতপ্ত সূর্য খুঁজে খুঁজে হয়রান। কোথাও নেই সরণ্যু। কী হল তার? কোথায় গেল সে? কোথাও না পেয়ে ছুটলেন ত্বষ্টার কাছে। বিশ্বকর্মা সব শুনলেন। দেখলেন, তার সেই আদিম তেজ সরণ্যুর সহ্য না করতে পারারই কথা। আরও দেখলেন, সূর্যও সত্যিই অনুতপ্ত। ভাবলেন, ওর তেজটা একটু ছেঁটে দিলেই সব ঝঞ্ঝাট মিটে যাবে। তাই তাকে একটা কুমোরের চাকে বসিয়ে পাক দিলেন। তারপর একটা ধারালো বাটালি নিয়ে সূর্যকে চাঁছতে শুরু করলেন। চাঁছতে চাঁছতে সাত ভাগই কেটে বেরিয়ে গেল। এক ভাগ যেটা রয়ে গেল, তার জ্যোতি অমর, তার ওপর আর বাটালি চলে না। ত্বষ্টা তখন তাকে বেশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভালো করে দেখে ছেড়ে দিলেন। তারপর সরণ্যু ফিরে এলো সূর্যের ঘরে খুসী মনে।

এ গল্পটা ঋগ্বেদের। নিছক গল্পই কি? সরল আদিম মানুষের ছোট্ট নাতিটিকে ভোলাবার গপ্পো? নাকি, আরো কিছু আছে? ত্বষ্টা একটি নক্ষত্র যে। সূর্যের চেয়ে দেড় হাজার গুণ বড়। এবার কি মনে হচ্ছে না, রূপকথার ছাঁচে ঢেলে আসলে 'টাইডাল থিয়োরী'-টাকেই ঋগ্বেদের যুগের 'সরল আদিম মানুষ' আমাদের জন্যে রেখে দিয়েছিল?

(ওপরের গল্প দু'টো শ্রীমতী বেলা বাসিনী গুহ এবং শ্রীমতী অহনা গুহর 'ঋগ্বেদ ও নক্ষত্র' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।)

নবযুগের আলোকে দেখা প্রত্নবস্তু

উড্ডীন রথের কথা অনেক পড়েছি। সম্প্রতি আরো একটি বস্তুর কথা পড়েছি পণ্ডিত সুখময় ভট্টাচার্যের 'রামায়ণের চরিতাবলী'তে। তিনি মুখে না বললেও, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, কুম্ভকর্ণ আসলে একটা প্রকাণ্ড 'রোবট'।

কত জ্ঞান, কত প্রযুক্তি লুকিয়ে রেখেছে আমাদের রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ। যে-জ্ঞান, যে প্রযুক্তি রয়েছে হাতের কাছে, সেগুলোকে না দেখে, কেন আবার কেঁচে গণ্ডুষ করে গবেষণাগারের বদ্ধ বাতাসে খেটে মরি? ওই রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ আর নানা প্রত্নবস্তুই বলে দিতে পারে, কোথায়, কোন্ সূর্যের, কোন্ গ্রহে আছে আমাদের আদি জনক। কোথায় সে অমৃত? কোথা সে অমরাবতী? অমৃতের সন্তান আমরা, কোথায় রয়েছে সে ঠিকানা ওই প্রাচীন পুঁথিপত্রের পাতায় পাতায়, ওই প্রত্নবস্তু সমূহের বুকে বুকে, তা আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে।

পৃথিবীময় ছড়ানো রহস্যময় নানা প্রত্নবস্তু কী ইঙ্গিত বহন করছে? তারা কি আদিম বর্বর মানুষের শিল্প নিদর্শন? নাকি, তারা দেবতার, তথা ভিনগ্রহের মানুষের— পৃথিবীর 'আধুনিক মানুষের' স্রষ্টাদের রেখে যাওয়া কোন উত্তরাধিকার?

পিরামিড রয়েছে মিশরে, রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকায়। চীনেও সেদিন একটা জেগে উঠেছে, একটা হ্রদের মাঝখান থেকে ভূমিকম্পের আলোড়নে। কিন্তু, পিরামিড কেন? ওগুলো তো দেখি রাজা-রাজড়াদের কবর। দেখতে পাই, সত্যিই রয়েছে রাজাবাদশার মমি করা দেহ কফিনে ঢাকা। তবু কিন্তু সন্দেহ জাগে। মনে হয় যেন, কবরটা একটা লোক-ঠকানো ব্যাপার। আসলে হয়তো ওর ভেতর লুকিয়ে রাখা হয়েছে সত্যিকার কোন মহামূল্য সম্পদ, হতে পারে কোন গ্রন্থাগার, কিংবা ভিনগ্রহবাসী দেবতাদের রেখে যাওয়া আরো কোন অমূল্য বস্তু। এ কথা মনে হওয়ার কারণ, যারা অমন সুদৃঢ় পিরামিড খাড়া করতে পেরেছিল, তারা সেখানে দু'টো মড়া রাখবে কেন, তা সে মড়া যত বড় লোকেরই হোক না? তবু যদি সে পিরামিড তাজমহলের মতন চোখ-জুড়োন একটা স্থাপত্যকর্ম হত!

আমাদের ভারতবর্ষেও আছে পিরামিডের ধরনের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্থাপত্যকর্ম। দাক্ষিণাত্যের মন্দির, কিংবা, ভুবনেশ্বর-কোণার্কের মন্দিরগুলোকে মন্দির বলার চেয়ে দুর্গ বলতে ইচ্ছে করে। দেখলেই মনে হয়, প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্তি সেখানে নেহাতই গৌণ,

কতকটা প্রক্ষিপ্ত যেন। তবু মুখ্য বস্তুটি যে কী, তা বোঝবার মত বিদ্যে আমার নেই। প্রায় মন্দিরেই গর্ভগৃহ আছে। গর্ভগৃহ কেন? কী প্রয়োজনে নির্মিত। পুরোহিতকুল সেখানে অনেক কিছু গোপন রাখেন। সে-গোপনতা স্রেফ সোনা-দানার জন্যে নিশ্চয়ই নয়। অথচ কী যে তাঁরা গোপন করেন, তা বোধহয়, আজকের পুরোহিতকুল নিজেরাও জানেন না। তাঁরা হয়তো শুধু ঐতিহ্য বহন করেই চলেছেন। খুঁজলে সেখানে যে কী মিলবে, তা আমি জানি না। তবু মন বলে, ওখানে শুধু দেবমূর্তি আর সোনা-দানাই সব নয়। তার জন্যে দার্টের প্রতিমূর্তি অমন প্রকাণ্ড স্থাপত্যকর্মের প্রয়োজন ছিল না। দেবমূর্তি কি আসলে ধোঁকা? কোণার্কের মন্দিরগাত্রে মিথুন মূর্তিগুলোকেও আমার ধোঁকা বলে মনে হয়েছে। মানুষের মনকে ধর্মীয়, না হয় জৈব চেতনায় ডুবিয়ে দিয়ে আসল জিনিসটিকে আড়ালে রাখার উদ্দেশ্যেই অমনটি করা হয়েছে বলে মনে হয়। ওইসব মিথুনমূর্তির যত ব্যাখ্যা শুনেছি, যত ব্যাখ্যা পড়েছি, তার কোনটা কি যুক্তিগ্রাহ্য? কোণার্কের গর্ভগৃহটি কার্জন সায়েব বন্ধ করে দিয়েছিলেন। হয়তো ওরই গভীরে কোথাও কিছু অপার্থিব সম্পদ এখনো লুকিয়ে রয়েছে। মন্দিরের গর্ভগৃহটি হয়তো কোন গোপন মণিকোঠার বহির্দ্বার। গর্ভগৃহগুলো কোনদিনই দেবতাকে রক্ষা করতে পারেনি। কত কালাপাহাড় কতবার এসেছে, দেবতা রক্ষা পাননি গর্ভগৃহের অন্ধকার অন্তরালে। আজ বোধহয় দেবতাকে সাক্ষী রেখে, তাঁর পেছনে কিংবা পায়ের তলায় কোন গোপন মণিকোঠা আছে কিনা, তার সন্ধান করাই আমাদের প্রত্নবিদের একান্ত কর্তব্য।

মহাবলীপুরের মন্দিরশ্রেণীর মাথায় খোদিত রয়েছে বিজাতীয় কতকগুলো মানুষের মুখ। মাথায় তাদের অদ্ভুত শিরস্ত্রাণ। কেন অমন মুখ? কেন অমন শিরস্ত্রাণ? ওরা তো কেউ ভারতীয় নয়। কার কাছে আমার এ প্রশ্নের জবাব পাবো? ভারতের প্রত্নবিদসমাজ, একবার এদিকে চোখ ফেরান, চেয়ে দেখুন আজকের নতুন আলোয়। আজো এখানে পূবের প্রত্নবিদ পশ্চিমের যুক্তি খণ্ডাতে চান, পশ্চিমের প্রত্নবিদ খণ্ডন করতে ব্যস্ত পূবের যুক্তি। এই সেদিনও ভূপালের কাছে গুহাশ্রেণী আবিষ্কৃত হওয়ার পরেও, ওই ধরনের কথাই উঠলো, ফলে আসল কাজটাই যাচ্ছে মার খেয়ে।

সারা পৃথিবীর মত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুহাশ্রেণী এখানেও আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের বেশিরভাগই কৃত্রিম, মানুষের হাতে কাটা। অত গুহা কি বাস করবার প্রয়োজনে কাটা হয়েছিল? পাহাড় ফাটিয়ে গুহা না কেটে বাড়ি তৈরি করা কি সোজা হত না? যারা

অমন মন্দির, অমন পিরামিড গড়তে পারতো, বাড়িও তারা নিশ্চয়ই তৈরি করতে পারতো। রামায়ণ, মহাভারতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদের বর্ণনাও তো মেলে। তা হলে? তা হলে কি যুদ্ধকালীন নিরাপত্তার প্রয়োজনে কাটা হয়েছিল অমন গুহাশ্রেণী? কিন্তু সাধারণ যুদ্ধে গুহাবাসের প্রয়োজন হয় না। সে তো দরকার হতে পারে একমাত্র পারমাণবিক যুদ্ধে। পারমাণবিক যুদ্ধের বিষক্রিয়া থেকে বাঁচবার জন্যে আজ মাটির নিচে শহর বসানো হচ্ছে। সে তো যথেষ্ট ব্যয়-সাপেক্ষ, এবং সময়সাপেক্ষও বটে। গুহা কাটা তার চেয়ে কম ব্যয় এবং কম সময়সাপেক্ষ তো বটেই, নিরাপত্তার দিক থেকেও কোন অংশে কম নয়। থাক সে কথা।

ক্রমবিকাশের ধারায় বাঁদর থেকে মানুষে এসে পৌঁছতে যে দীর্ঘ সময় লাগার কথা, তত সময় তো লাগেইনি বরং তার অতি ক্ষুদ্র একটা ভগ্নাংশের ভগ্নাংশ মাত্র লেগেছে। লোরেন আইসলী বলেছেন, মানুষের আবির্ভাবের আকস্মিকতা দেখে মনে হয়, পশুজীবন ছেড়ে সে অল্পদিনই বুঝি বেরিয়ে এসেছে। যে শক্তি মানুষের মস্তিষ্ককে শিক্ষিত করতে অংশগ্রহণ করেছে, তার প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট না হয়েও বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী এই দীর্ঘ এবং দুঃসাধ্য বাঁচার লড়াই লড়তে লড়তে আজকের দিনের মননশক্তি কখনই সৃষ্টি করতে পারতো না। বরং, আরো একটা কিছু, শিক্ষার আরো একটা উপাদান, নিশ্চয়ই ছিল, যা বিবর্তনবাদী পণ্ডিতদের নজর এড়িয়ে গেছে।' ('নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন' থেকে উদ্ধৃত।) এই কথারই জের টেনে দানিকেন বলেছেন, 'ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান জীবেরা এ-গ্রহে পদার্পণ করেছিলেন কিনা, সেই বিষয়টার অনুসন্ধান না করলে বাঁদর এবং মানুষের মাঝখানকার সেই লুপ্ত অধ্যায়টিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

প্রাচীন মানুষের রেখে যাওয়া কাহিনী-কিম্বদন্তী-পুরাণ থেকে এবং পৃথিবীময় ছড়ানো-ছিটানো প্রত্নবস্তুর অদ্ভুত, অপূর্ব চমৎকারিত্ব দেখে মনে হয়, মহাপ্রাযুক্তিক সভ্যতা সম্পন্ন কোন ভিনগ্রহবাসী মানুষ নিশ্চয়ই একদিন এ পৃথিবীতে পদার্পণ করে ছিলেন, এবং মানুষের সঙ্গে ওইসব বস্তুও সৃষ্টি করে গেছেন। আরো একটা কথা মনে হয়, কোন একটা গ্রহ থেকে তাঁরা আসেননি। এসেছিলেন ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ থেকে ভিন্ন ভিন্ন দলে। সবাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন মানুষকে নিয়ে। পৃথিবীতে তিনটে রঙের মানুষের প্রাধান্যই বেশি চোখে পড়ে— শ্বেত, পীত এবং কৃষ্ণ। শ্বেত, তথা আর্য জাতি এবং পীত বা মঙ্গোল গোষ্ঠীর প্রাধান্য আজ বেশি। এদের ভেতর আবার আর্য গোষ্ঠী উন্নতও বটে, বুদ্ধিমানও বটে।

পৃথিবীতে আসা বিভিন্ন গ্রহবাসীদের ভেতর আদান-প্রদানও ছিল, বৈরিতাও ছিল। দু'টোরই আজ প্রমাণ মেলে। একই কাহিনীর রকমফের রয়েছে সর্বত্র। তাই মনে হয়, আদান-প্রদান ছিল। আর, বৈরিতা না থাকলে অ্যাটমিক বাংকারের মতন পিরামিড আর গুহা তৈরী করবার প্রয়োজন হয় না।

যুদ্ধ একটা, অন্তত একটা, নিশ্চয়ই হয়েছিল। এরিখ ফন দানিকেন তাঁর 'দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ?', 'নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন' এবং 'বীজ ও মহাবিশ্ব' গ্রন্থে সে যুদ্ধের ভুরিভুরি নজির হাজির করেছেন। যে যুদ্ধ সাধারণ যুদ্ধ নয়। যা হয়েছিল তা পারমাণবিক যুদ্ধ। সে প্রকাণ্ড সর্বনাশা যুদ্ধের কথা মহাভারতই বলেছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখলে বোধহয় ভালোই হবে। সেকালের লোকসংখ্যা সম্পর্কে আধুনিক হিসেব, দু'কোটি। সারা পৃথিবীর লোকসংখ্যা দু'কোটি? এ হিসেবের সঙ্গে মহাভারতের 'অক্ষৌহিনীর' সংখ্যাটাকে একবার ভেবে দেখবেন। পিরামিড-মঠ-মন্দির গড়ার কাজে লাগা জনমজুর ইত্যাদির কথা না হয় ছেড়েই দিন। দু'কোটি মানুষের পক্ষে এ পৃথিবীটা এত বড় যে ছোটখাটো ঝগড়া-বিবাদ ছাড়া একটা সর্বনাশা পারমাণবিক যুদ্ধের কথা চিন্তা করা অসম্ভব।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়তো সেই পারমাণবিক যুদ্ধেরই একটা অংশ, কিংবা গোটা একটা যুদ্ধের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। সে যুদ্ধে, সেই সর্বনাশা পারমাণবিক যুদ্ধে কত জায়গা যে মরুভূমি হয়ে গিয়েছিল, তারই কি কিছু ইয়ত্তা আছে? মরুঅঞ্চলগুলো খোঁড়াখুঁড়ি করলে হয়তো তার কিছু হদিস মিলতে পারে।

পারমাণবিক যুদ্ধ না হলে এমন সুদৃঢ় পিরামিডই বা গড়া হল কেন, আর অত গুহাই বা কাটা হল কেন? আর গুহার গভীরে ধাতুফলকে উৎকীর্ণ লিপিসমন্বিত অমন প্রকাণ্ড গ্রন্থাগারই বা রাখা হল কেন? কালজয়ী সেই গ্রন্থাগার আছে পেরু-ইকোয়েডারের মাটির নিচের হাজার হাজার মাইল লম্বা গুহাশ্রেণীতে (বীজ ও মহাবিশ্ব)। পৃথিবীর এ তল্লাটেও কি অমন চিরস্থায়ী গ্রন্থাগার কোথাও নেই? ওই পিরামিডগুলো, এই মন্দিরগুলো খুঁজলে কি তেমন একটা গ্রন্থাগার মিলবে না? ভিনগ্রহের 'দেবতারা' নিশ্চয়ই রেখে গেছেন কোন উত্তরাধিকার প্রকাণ্ড ওই পিরামিড-মন্দিরের গর্ভগৃহের গভীরে। দু'টো মড়া রাখবার জন্যে, দু'টো দেবমূর্তি বসাবার জন্যে অমন পিরামিড-মন্দির নিশ্চয়ই গড়া হয়নি। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

তথাকথিত 'গুহা মানব' যারা, তারা যদি গুহায় বাস করে থাকে, তো প্রাকৃতিক

খানা-খন্দেই বাস করেছে। গুহা কাটবার বিদ্যে তাদের থাকবার কথা নয়। আর, গুহা কাটতে পারলে, ঘরও নিশ্চয় বাঁধতে পারতো। তাছাড়া, মানুষ গুহায় বাস করবে, একথা একান্ত অবিশ্বাস্য, তা সে যত আদিম মানুষই হোক না কেন। বনের পশু-পাখি যেখানে বাসা বাঁধতে পারে, সেখানে মানুষ, তা সে যত আদিমই হোক, নিজের মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকু করতে পারবে না, একথা কি বিশ্বাস করা যায়? 'গুহা মানব' বলে কোন জীবই বোধহয় ছিল না। ওটা প্রত্নবিদদের নিছক অতিসরলীকরণ। আর যদি ধরে নিই, গুহা ছিল 'গুহা মানবের' বাসস্থান, তাহলে বলতে বাধা কোথায়, যে গুহা প্রাচীরের চিত্রশিল্প ওদেরই হাতের কাজ? জানবার প্রয়োজন নেই, সে গুহা প্রাকৃতিক, কি কৃত্রিম। ভাববার প্রয়োজন নেই, সে গুহায় কী আলো জ্বালা হত। ভাববার প্রয়োজন নেই, প্রদীপের আলোয় ছবি আঁকা যায় কিনা। ভাববার প্রয়োজন নেই, চিত্রকলা সভ্যতার উচ্চ পর্যায়ের দান।

গুহা কাটা হয়েছিল নিশ্চয়ই যুদ্ধের কারণে, এবং পারমাণবিক যুদ্ধের প্রয়োজনে। সে সব গুহা তৈরী হয়েছিল, মূল্যবান বস্তুনিচয় রাখবার প্রয়োজনে, আর সাময়িকভাবে বাসের প্রয়োজনে। সাময়িকভাবে যারা বাস করেছিল, তারা হয়তো অসামরিক নাগরিকদের পরিবারবর্গ আর তারাই হয়তো অবসর বিনোদন করতো গুহা প্রাচীর অলঙ্কৃত করে, ছবি এঁকে।

ছবি যারা এঁকেছে, তাদের ভেতর ছোট ছেলেমেয়ের আঁকা-আঁকিবুকিও হয়তো আছে, কিন্তু সুসমঞ্জস, সুষমামণ্ডিত ছবিই তো বেশি। অসভ্য মানুষ, কিংবা একটা ছোট ছেলে হয়তো একটা গোটা হরিণও আঁকতে পারে কোন গতিকে, কিন্তু একটা পলায়মান হরিণ আঁকবে কেমন করে? গতি দেবে কী করে? তার জন্যে যে শিক্ষা দরকার। এত কথার পরেও যদি কেউ তর্ক তোলেন, তথাকথিত 'গুহামানবই' ও ছবি এঁকেছে, যেহেতু সে পলায়মান হরিণ অনেক দেখেছে, তাহলে আমিও বলবো, যে-বাঁদর অনেক অনেক কলা খেয়েছে সেও কলার একটা চমৎকার ত্রিমাত্রিক ছবি আঁকতে পারবে। মানবেন কেউ আমার কথা?

পারমাণবিক যুদ্ধের কথা বলছিলুম। আরো একটা কারণে আমার মনে হয়, প্রকাণ্ড, প্রচণ্ড একটা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ নিশ্চয়ই হয়েছিল।

আমাদের এই দিকটাতেই তিন তিনজন শান্তির দূত এসেছিলেন, অল্প সময়ের পরিধিতে। তাঁদের মধ্যে প্রথমজন বুদ্ধ। না, শুধু বুদ্ধ নয়, তথাগত। কোথা থেকে

'আগত' তিনি? শুনি কপিলাবস্তু থেকে। তবু 'তথাগত', শব্দটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থটাই মনে বেশি করে লাগে। জ্ঞানী বলে যদি 'বুদ্ধ' বলি, তাহলে 'তথাগত' বলতে, 'তথা হইতে আগত' বলবো না কেন। কিন্তু সে 'তথা' যে কোথা, তা তো জানি না।

তথাগত শান্তির বাণী প্রচার করলেন কেন? কী অশান্তি ঘটেছিল? শুধু শুধু তো কেউ শান্তির বাণী প্রচার করে না। তাঁরই সমসাময়িক, কনফুসিয়াস। তাঁদের কিছু পরেই এলেন যিশু। এঁদের কেউই আধ্যাত্মিকতার ধার দিয়েও যাননি, তিনজনেই প্রচার করে গেলেন শান্তির বাণী, প্রেমের বাণী। দিয়ে গেলেন নীতিশিক্ষা। কেন? তাহলে কি ধরে নিতে পারি না, প্রচণ্ড বড় রকম একটা অশান্তি নিশ্চয়ই ঘটেছিল তাঁদের কালে? কে এই সন্দেহ নিরসন করবে? যাঁরা পারেন, তাঁরা এসব নিয়ে বড় মাথা ঘামান না। অথচ, সত্যিই কি একথা ভাববার মত কথা নয়?

তিন মহাত্মার কেউই ঠিক ধর্মগুরুর পর্যায়ে পড়েন না। তাহলে ভেবে দেখতে দোষ কোথায়, যে তাঁরা শান্তির দূত হয়ে কেন এসেছিলেন? কী অশান্তি ঘটেছিল? এ প্রশ্ন কি একটা গবেষণাকর্মের বিষয় হতে পারে না? হলে, মহাভারত অশুদ্ধ তো হবেই না, বরং অশুদ্ধ যেটুকু আছে, সেটুকু শুধরে পবিত্র হয়ে উঠবে। সে গবেষণার শেষে খুঁজে পাবো, ভোগ করতে পারবো সেই মহামূল্য উত্তরাধিকারকে, যা আমাদের সৃষ্টিকর্তা, সেই গ্রহান্তরবাসী 'দেবতারা' রেখে গেছেন আমাদেরই জন্যে।

তথাগতের বাণী কি শুধু কাঞ্জুরের গ্রন্থ সমষ্টির পাতায় পাতায় ধরা থাকবে ধর্মতত্ত্ব হিসেবে না সে-বাণীর টীকা-টিপ্পনী-ব্যাখ্যায় ভরা থাকবে তাঞ্জুরের অসংখ্য পুঁথির পত্রসমষ্টি? আজকের চোখের আলোয় কি তাদের বিচার হবে না? কবে আসবেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান?

ভারতের প্রত্নবস্তুর কথা বলছিলুম। কত জায়গায় কত কী যে ছড়িয়ে রয়েছে, কে তার খবর রাখে! সেদিন পীতর কলোসিমোর 'নট অব দিস্ ওয়ারলড্' পড়তে পড়তে চমকে উঠেছিলুম। কাছাকাছি কোথাও এমন জিনিস থাকতে পারে বলে তো কখনো শুনিনি। বই থেকে খানিকটা পড়ে শোনাই। মহাভারতের যুদ্ধের কথা বলতে বলতে লেখক বলেছেন,—

সে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের কোন চিহ্ন কোথাও নেই, একি সম্ভব? গবেষকদের কাছে শুনি অসংখ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, শুধু গিয়ে দেখার কষ্টটুকু স্বীকার করার ওয়াস্তা। ব্যাপারটা যে খুব সহজ, তা হয়তো নয়, কেননা, হাজার হাজার বছর ধরে

অরণ্যকবলিত হয়ে রয়েছে সে সব স্থান। কিন্তু উপমহাদেশের মৃত নগরগুলোকে যদি খুঁজে বের করতে পারা যায়, তাহলে হয়তো দেখতে পাবো, ভারতের সেদিনকার নগরসমষ্টি আজকের চেয়ে কম মোটেই নয়। মাঝে মাঝে যে-সব বিবরণ চোখে পড়ে তাতে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। যেমন ধরুন, আবিষ্কারক 'দা কাম্পের' কথা। তিনি লিখেছেন, রাজমহলের গঙ্গা আর পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় তিনি দেখেছেন, পুড়ে-যাওয়া, অঙ্গারিভূত ধ্বংসাবশেষ। সাধারণ আগুনে তেমনভাবে পোড়া সম্ভব নয়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব চাঙড়, একটার সঙ্গে আর একটা জুড়ে গেছে, প্রচণ্ড উত্তাপে গলে গিয়ে, গর্ত হয়ে গেছে নানা জায়গায়, "যেন টিনের (রাং) চাঙড়ের ওপর ইস্পাত গলিয়ে ঢেলে দেওয়া হয়েছে।"

ব্রিটিশ রাজপুরুষ, জে ক্যামবেলও দেখেছেন অমন ধ্বংসাবশেষ, আরো একটু দক্ষিণে। একটা বাড়ির ভেতরের উঠোন প্রায় কাচ হয়ে গেছে। কে অমন অগ্নিকাণ্ড করেছিল কে জানে। সে শক্তির সৃষ্টি কোন্ মানুষের হাতে, তাও জানি না।

আবিষ্কারক এবং মৃগয়াবিলাসী এইচ জে হ্যামিল্টন রেখে গেছেন, তাঁর জীবনের চরমতম বিস্ময়কর একটি অভিজ্ঞতার কথা। তিনিও একটা বাড়ি দেখেছিলেন মাটির তলায়, নিচু গম্বুজওলা বাড়ি। "কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ করে পায়ের তলার মাটি বসে গেল। একটু সরে গিয়ে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে ভেঙে গর্তটাকে বড় করলুম। তারপর সেই ফাঁক দিয়ে আস্তে আস্তে ভেতরে নেবে পড়লুম। যেখানে নাবলুম সেটা একটা দরদালান, আমার তৈরী গর্ত দিয়ে আসা আলোয় দালানটা আলোকিত। চার দিক চেয়ে দেখি, দেয়াল-টেয়াল সব 'স্ফটিকের' তৈরী। একদিকে রয়েছে কেমন এক ধরনের একটা টেবিল আর চেয়ার, সেও ওই স্ফটিকেরই তৈরী। প্রায় মানুষের মত দেখতে একটা মূর্তি চেয়ারের ওপরে কেমন যেন ঘাড় গুঁজে বসে রয়েছে। ভাবলুম, কোন ভাস্কর্য বুঝি ওই ভাবে ভেঙে পড়ে রয়েছে। কাছে গিয়ে ভালো করে দেখতে গিয়ে ভয়ে আঁতকে উঠলুম। যে-মূর্তিকে মনে হয়েছিল কাচের, দেখি তার দেহের ভেতরে গোটা কঙ্কালটাই রয়েছে।" দেয়াল, আসবাব, মায় মানুষ পর্যন্ত 'কাচ' হয়ে গেছে...। মহাভারত এবং দ্রোণ পর্বের সীমানার মাঝে যে কী বিকট রহস্য লুকিয়ে রয়েছে, কে জানে।"—কলোসিমো আর কোন হদিস দেননি। এখানে অনেককে জিজ্ঞেস করেছি, কেউ বলতে পারেননি রাজমহল সম্পর্কে কোন কথা।

আর্যপূর্বকালের নগর মোহেঞ্জোদাড়ো আর হরপ্পা। পরিত্যক্ত সে পুরী। পোড়া

বাড়ির আর কঙ্কালের স্তূপ দেখে মনে হয়, যুদ্ধ-বিগ্রহ একটা হয়েছিল। কেন যুদ্ধ হয়েছিল, কার সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল, কতকাল আগে হয়েছিল সে যুদ্ধ, তা জানবার আগ্রহ আমার বড় নেই, আমি শুধু ভাবি অমন অপূর্ব নগরপরিকল্পনা যারা করেছিল, এবং হাতে-কলমে সে নগর ফাঁদতেও পেরেছিল, তারা কেমনতরো আদিম। বাড়ি-ঘর তৈরী করতে তারা ব্যবহার করেছে পোড়া ইঁট, সব এক মাপের। কী হরপ্পায় কী মোহেঞ্জোদাড়োতে, সর্বত্র এক মাপের ইঁট, একভাবে পোড়ানো, যেন সব এক 'খোলা' থেকে এসেছিল। বাড়িতে বাড়িতে ছিল স্নানাগার, শহরের মাঝখানে ছিল সাধারণ স্নানাগার। পথঘাট নিখুঁত করে সাজানো, চমৎকার করে তৈরী। জায়গায় জায়গায় তিরিশ ফুট চওড়া। রাস্তার নিচে ঢাকা-পয়োনালী। বাস্তুবিদ্যার জ্ঞান কতখানি উচ্চ পর্যায়ের হলে অমন একটা শহর বসানো সম্ভব হয়? শুনি, সাধারণ স্নানাগারে জল বদলানো যেতো। তবে কি কলের জলের ব্যবস্থা ছিল? ভারী কিংবা ভিস্তি দিয়ে একটা প্রকাণ্ড স্নানাগার ভরিয়ে জলকেলি করতো সেখানকার মানুষ, এ যেন কেমনতরো কথা নয়? বাড়ির স্নানাগারে তোলা-জল ব্যবহার করা সম্ভব বটে, কিন্তু সাধারণ স্নানাগারে তা অসম্ভব। তাছাড়া, জল তুলে আনতে গেলেও তো বেশ খানিকটা দূরের নদী থেকে আনতে হয়। ক্রীতদাস-দাসী হয়তো ছিল, হয়তো ছিল না। থাকলেও তাদের দিয়ে অমন কাজ করানো সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু আর্যপূর্বকালে কলের জল? আমি জানি না।

আর একটা কথা। হরপ্পা সভ্যতা বিস্তৃত ছিল ইরাবতী-সরস্বতী অঞ্চল থেকে শুরু করে দক্ষিণে সিন্ধু নদের তীর বরাবর চান্হুদাড়ো ছাড়িয়ে। সমস্ত এলাকাটা মরুভূমির পশ্চিম পাড় ঘেঁসে।

শুনি, বর্বর আর্যদের আক্রমণেই নাকি সে সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে। কথাটা কি খুব বিশ্বাসযোগ্য? যাদের নগরপরিকল্পনা বিংশশতাব্দীকেও লজ্জা দেয়, যাদের প্রতিরক্ষা-প্রাকার দেখলেই বোঝা যায়, কিরকম সুদৃঢ় ছিল সে-প্রাকার, তারা হেরে গেল বর্বর, যাযাবর আর্যদের কাছে? বর্বর যাযাবরের সামরিক কৌশল কি সভ্য মানুষের সমতুল হতে পারে? বর্বর দুর্ধর্ষ হতে পারে, কিন্তু কৌশল জিনিসটা যে সভ্য মানুষেরই একচেটে। বল চিরকালই কৌশলের কাছে হার মেনেছে। সভ্যতার অমন উচ্চস্তরে যারা উন্নীত ছিল, তারা যে যাযাবর আর্য, বর্বর আর্যদের কাছে হেরে যাবে, এ কথা বিশ্বাস করা একান্ত কঠিন। তাহলে কি কুরুক্ষেত্রের পারমাণবিক যুদ্ধেই সে সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল?

রাজস্থানের মরুভূমিটাকে কেমন যেন স্বাভাবিক মরুভূমি বলে মনে হয় না। বৃষ্টি না হলে ধীরে ধীরে একটা জায়গা মরুভূমি হয়ে যেতে পারে ঠিকই, কিন্তু উল্টো দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে, কোন জায়গা মরুভূমি হয়ে গেলে সেখানে আর বৃষ্টি পড়বে না। মেঘে ভারী-জলকণা মরুভূমির উত্তপ্ত হাওয়ায় বাষ্প হয়ে ওপরে উঠে যাবে, উড়ে যাবে। এখানে দেখি, চার পাশে সর্বত্র বৃষ্টি হয়, জনপদও গড়ে উঠেছে, শুধু মাঝখানকার খানিকটা জায়গা ঊষর মরুতে পরিণত হয়ে গেছে। প্রাক্ আর্যযুগের নদীগুলোও ওরই বালির নিচে হারিয়ে গেছে। বৈদিকযুগের স্মৃতি ডুবে আছে ও মরুর তলায়!

মহাভারতের কালে যে একটা প্রকাণ্ড পারমাণবিক যুদ্ধ হয়েছিল, সে কথা আজ বোধ হয় সবাই মানবেন। সেই যুদ্ধের কারণেই কাটা হয়েছিল গুহাশ্রেণী নানা স্থানে, অসামরিক নাগরিকদের আশ্রয় দিতে। পারমাণবিক যুদ্ধের সময়ে বাড়িতে থাকা তো নিরাপদ নয়, তা সে বাড়ি যত মজবুতই হোক। বিস্ফোরণের ঝটিকা-বিক্ষোভ যে সমস্ত কিছু গুঁড়িয়ে ধুলো করে দেবে, তার সর্বনাশা আগুন যে সব পুড়িয়ে আঙরা করে দেবে।

মাটিও বাঁচবে না, মরুভূমি হয়ে যাবে। অগ্নিবর্ষণের ফলে। সেদিনকার সে বোমা যে নাগাসাকির ওপর ফেলা বোমার চেয়ে বহুগুণ বড় ছিল, তা মহাভারতের বিবরণ পড়েই বুঝতে পারি। মনশ্চক্ষে দেখে অমন বিবরণ দিতে পারতেন না ব্যাসদেব, চর্ম চক্ষেই দেখেছিলেন তিনি। হিরোসিমা-নাগাসাকির ওপর পারমাণবিক বিস্ফোরণের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কেউ কল্পনাও করতে পারেনি, তার ভয়াবহতার রূপটি কেমন হবে। চর্মচক্ষে দেখেছিলেন বলেই বলতে পেরেছিলেন, 'শ্বেততপ্ত ধূম্রজাল, সহস্র সূর্যসংকাশ অপরিসীম ঔজ্জ্বল্যে উঠতে উঠতে সব ভস্মে পরিণত করে দিলো'—('দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ?'—দানিকেন)—'আকাশে অগ্নিশিখা ব্যাপ্ত হইয়া তুমুল বাণবর্ষণ করিতে লাগিল...আকাশ হইতে বহুতর উল্কা পতিত হইতে লাগিল। দিক্ সকল প্রকাশ পাইল না এবং ভীষণ অন্ধকার আসিয়া পাণ্ডব সৈন্যের উপর নামিতে লাগিল। উষ্ণ বায়ু বহিতে লাগিল এবং সূর্যের তাপ তিরোহিত হইতে লাগিল। আকাশে মেঘ সকল রুধির বর্ষণ করিতে থাকিয়া গর্জন করিতে লাগিল। সমস্ত ত্রিভুবনই যেন সন্তপ্ত হইয়া সন্তাপিত হইল। সমস্ত মহাপ্রাণীই যেন বিচলিত হইয়া পড়িল এবং সূর্যও যেন অবনত হইয়া গেলেন।...প্রলয়কালে সংবর্তক অগ্নি যেমন সমস্ত ভূত দগ্ধ করে, সেইরূপ যুদ্ধে

সেই অস্ত্র ভয়বিচলিত সৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিল।' ('দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ?'— দানিকেন)।— না দেখলে এমন বিবরণ কি দেওয়া যায়?

ব্যাসদেবের বর্ণনার বিস্ফোরণ কোথায় ঘটেছিল? সে কি রাজস্থানের ওপর? তাই কি ওখানকার খানিকটা জায়গা মরুভূমি হয়ে গেছে? গোবীর নিচেও তো কত ধ্বংসাবশেষ আছে, শুনতে পাই। থারের নিচেও তো অমন থাকতে পারে। হতে পারে, এ আমার অনুমান, কিন্তু ব্যাপারটা কি নেহাতই অসম্ভব? সরস্বতী-দৃশদ্বতীর কূলে তো বহু জনপদ থাকার কথা। কোথায় গেল সে সব জনপদ? তাদের খুঁজে দেখতে দোষ কি?

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালজয়ী মন্দির দাঁড়িয়ে রয়েছে শ্যাম-কম্বোজের অরণ্যের গভীরে। লোক-কাহিনী বলে, সে মন্দির দেবতার হাতে গড়া। মানুষের হাতে গড়া বলতে সত্যিই বাধে। ফরাসী বৈজ্ঞানিক আঁরি মুওৎ এক মুখে বলে শেষ করতে পারেননি সে-মন্দিরের রূপ-সৌন্দর্যের কথা। ১৮৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি গিয়েছিলেন ওঙ্কারবাট (শ্যাম দেশের ভাষায়, 'আঙ্করবাট') দেখতে। তার কথাতেই ব্যক্ত করি সে-মন্দিরের সৌন্দর্য মহিমা—

'এ মন্দিরের সামনে দাঁড়ালে মন যেন নুয়ে পড়ে, ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় যেন। কল্পনা দিশেহারা, শুধু মূক প্রশংসায় চেয়ে থাকি, নীরবে ভক্তিবিহ্বল চিত্তে। সমগ্র পৃথিবীতে কখনো যার তুলনা মেলেনি, সেই মহান্ স্থাপত্যের উদ্দেশ্যে প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করবার ভাষা কোথায় পাবো?

'...পায়ে-পায়ে এগিয়ে চলেছি। বিস্ময়ের পর বিস্ময় ফুটে উঠছে চোখের ওপর। নামহীন এক তূরীয় আনন্দে আমার সমস্ত সত্তা তলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে সমাধির তন্ময়তার গভীরে।...'

কে ওই ওঙ্কারধাম, ওঙ্কারবাটের স্রষ্টা? কী উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছিল অমন অপূর্ব, অভূতপূর্ব অট্টালিকা শ্রেণী? (অট্টালিকা বলার কারণ, অনেকে নাম দিয়েছেন প্রাসাদ, কেউ বা বলেছেন হারেম!) পরবর্তীকালে অনেক বৌদ্ধ এবং হিন্দু স্থাপত্য প্রক্ষিপ্ত হয়েছে তার ওপরে। তার আগে? সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা অমন মঠ-মন্দির অট্টালিকার পানে কি শুধু চেয়ে থাকবো আর অবাক মানবো? ভেবে দেখবো না, কোন্ সে 'দেবতা' রেখে গেছেন অমন অপূর্ব সৌন্দর্য-সম্ভার?

কুতুবমিনার চত্বরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা লৌহস্তম্ভ। ও-লোহা কে ঢালাই

করেছিল? অক্ষয় সে-স্তম্ভ। মহাকালের করস্পর্শ ঘটেনি তার অবিনশ্বর অঙ্গে। কী ইঙ্গিত বহন করছে ওই কালজয়ী লৌহখণ্ড? বলছে নাকি, 'আমার কালের প্রযুক্তি কৌশল মারফত যাকে রাখবার নয়, তাকেও রেখে গেলুম। একে সঙ্কেত বলে মনে কর, খুঁজে দেখো, আরো অনেক অনেক কিছু রেখে গেলুম তোমাদের কল্যাণে।'

একখানা হিন্দি বই, নাম, 'হাজার বছরের পুরোন জৈন কথা ও কাহিনী'। তাতে একটা গল্প আছে, বলি শুনুন।—ভগীরথ নামে এক রাজা ছিলেন। খুব প্রজাবৎসল তিনি। তাঁর রাজ্যে একবার কয়েক বছর ধরে চলতে থাকে অনাবৃষ্টি, অজন্মা। প্রজাদের নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা। উপায়ান্তর না দেখে রাজাকে গিয়ে ধরে পড়লো তারা। রাজা তখন ভেবেচিন্তে দীর্ঘ এক খাল কাটালেন। সেই খালই গঙ্গা।—গল্পটা পৌরাণিক গল্পের রকমফের। দেখিনি, শুনেছি, গোমুখীর জলকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে প্রকাণ্ড একখানা পাথরের কড়ি বসানো আছে। সেখানে সে পাথর অক্ষয় তো বটেই, ও অঞ্চলের পাথরও নয় সেটা। আর, দেখলেই নাকি বোঝা যায়, ওটা কৃত্রিম উপায়ে বসানো। সত্যি-মিথ্যে জানি না। যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা হয়তো বলতে পারবেন।

তবে একটা কথা মনকে নাড়া দেয়। গঙ্গাকে আমরা পুজো করি। কেন? পৃথিবীর কোন নদী তো অমন পূজো পায় না। অমন যে নীল নদ, মিশরের প্রাণ, তাকেও মিশরবাসীরা পূজো করে না। আরো একটা প্রথা চালু ছিল। এক আঁজলা মাটি তুলে পাড়ে ফেলে দিতে হত স্নানার্থীদের। উদ্দেশ্যটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন রাখে না।

সে কথা থাক। আমার প্রশ্ন, কী শক্তি দিয়ে কাটা হয়েছিল অমন প্রকাণ্ড দীর্ঘ নদী? অমন একটি নদী কাটা তো চাট্টিখানি কথা নয়। এই কিছুকাল আগে যে-মানুষ বাঁদরের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, তার পক্ষে এমন কাণ্ড করা কি সম্ভব?

গোটা পৃথিবীর কথা ছেড়ে শুধু ভারতের পুঁথিপত্তোর আর প্রত্নবস্তুর দিকে নজর ফেরালেই দেখি প্রশ্নের পাহাড় জমে রয়েছে তাদের ঘিরে, সদ্ ব্যাখ্যার অপেক্ষায়। কী ইঙ্গিত তারা বহন করছে, তা জানবার, বোঝবার সময় কি আজো হয়নি? দানিকেনের (নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন) কথায় বলি,—

'অজ্ঞেয় অনন্তের অন্তরে ঈশ্বরের সন্ধান করার চেয়ে এই পৃথিবীতেই কি তাঁদের সন্ধান করা, তাঁদের বাণীর ব্যাখ্যা খোঁজা বেশি যুক্তিযুক্ত নয়? মানুষ চিরকাল যাঁদের কামনা করেছে, প্রার্থনা করেছে যাঁদের কাছে সেই দেবতাদের পক্ষে কি কোন

প্রাযুক্তিক নির্দেশ এ জগতে রেখে যাওয়া সম্ভব নয়, যার মারফত একদিন মহাকাশে আমরা তাঁদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবো?'

★ ★ ★

মানুষের ইতিহাস নিয়ে আজ পর্যন্ত বহু গবেষণা হয়েছে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা আজও চলছে। ডারউইনের বিবর্তনবাদ আজ সর্বজনগ্রাহ্য, যদিও 'মিসিং-লিংক' সম্পর্কে কোন সুষ্ঠু সমাধান এখনো দূর অস্ত্। মানুষের ঠিকানার প্রসঙ্গে ডাঃ এরিখ ফন দানিকেনের নতুন তত্ত্বের আলোচনা কারও কারও কাছে অবাস্তব, এমন কি গাঁজাখুরি বলে মনে হলেও অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে না নিশ্চয়ই। পৃথিবীর সর্বত্র নানা সংস্কৃতির প্রাচীন পুঁথিপত্রে মানুষের উৎপত্তির ইতিহাস সম্পর্কে কত কত গল্প-গাথা লিপিবদ্ধ আছে। সে সব গল্পের সবগুলোই হয়তো যুক্তিগ্রাহ্য নয়— কিন্তু একেবারে ফেলনাও নয় তারা। অলীক কল্পনা বলে কোন ক্রমেই তাদের উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম স্পন্দন জাগাতে মহাবিশ্ব থেকে ভেসে আসা কোন বীজ-কণাই দায়ী, এ কথাকে আজ আর কেউ কল্পনা-বিলাস বলে অবহেলা করবেন না, আবার, বিবর্তনই যে মানুষের উৎপত্তির একমাত্র কারণ, এ কথা আজ অনেক বিজ্ঞানীই মানতে নারাজ।

এ প্রসঙ্গে ভাষাতত্ত্ববিদ্ সোবিয়েত পণ্ডিত, ডাঃ বিয়াচেস্লাভ সাইৎসেবের 'On the Earth and Sea' গ্রন্থের কথা উল্লেখ করি। তিনি লিখেছেন,

"মানুষের উৎপত্তির উৎস কেমনতরো ছিল, এ রহস্য পৃথিবীর প্রাচীনতম রহস্যনিচয়ের অন্যতম। এ রহস্যের জবাবে তিনটি মতবাদ পেশ করা যায়,—

১। মানুষ পার্থিব ক্রমবিকাশের পরিণতি

২। মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি

৩। মানুষ ব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোথাও, অন্য কোন গ্রহে শুরু হওয়া দীর্ঘ অনবচ্ছিন্ন এক ক্রমবিকাশের ধারায় পৃথিবীতে বয়ে আসা পর্যায়ক্রমের অংশবিশেষ।"

প্রথম মতটি যুক্তিগ্রাহ্য ও বিজ্ঞান-সম্মত। কিন্তু তার ভেতর একটি প্রধান কারণ আজো অব্যাখ্যাত রয়ে গেছে। বাঁদরের খোলস ছেড়ে মানুষ কেমন করে বেরিয়ে এলো, সেই কথাটির ব্যাখ্যা আজো মেলেনি। এ পৃথিবীর প্রথম মানুষটি যে কে, তারও সন্ধান মেলেনি।

দ্বিতীয় মতটিতে সন্দেহের অবকাশ যথেষ্ট আছে। সৃষ্টিকার্যের মাধ্যমে হঠাৎ কেমন

করে মানুষ তৈরী হল, সে কথা কল্পনা করা নিতান্তই অসম্ভব। বিজ্ঞানের নিরীক্ষায় এ মতবাদ একান্ত অসম্ভব।

তৃতীয় প্রকল্পটি নিঃসন্দেহে বিবেচনার যোগ্য। (রক্ষণশীল বিজ্ঞানী সমাজ হয়তো এ মতবাদকেও অবাস্তব, কষ্ট-কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে চাইবেন, কিন্তু বর্তমান স্পুৎনিকের দাপটের যুগে এতখানি অন্ধ সেজে বসে থাকা কি উচিত হবে?) অনেক পৌরাণিক কাহিনী বলে, মানুষের বিকাশ ঘটেছিল মহাবিশ্বের অন্য কোথাও, অন্য কোন গ্রহে, এবং সৃষ্টির প্রথম পর্যায় পার হওয়ার পর সে এসেছে পৃথিবীতে, আমাদের সূর্যের তৃতীয় গ্রহে। তারপর থেকে তার বিকাশ সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে একাদিক্রমে। বিজ্ঞানী মহলে কেউ কেউ মনে করেন, প্রোটোজোয়া থেকে আজকের দিনের বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষে এসে পৌঁছতে যে সময় লাগার কথা, সে বয়স আমাদের পৃথিবীরই হতে এখনো অনেক বাকী।

একটা স্লাভ্ কাহিনীতে আছে, মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল, অনেক অনেক কাল আগে, পৃথিবী থেকে অনেক অনেক দূরে। সৃষ্টি শেষে স্রষ্টা তাঁর দূতবৃন্দকে বললেন, 'কয়েক জোড়া নর নারীকে রেখে এসো পৃথিবীর মাটিতে। সেখানেই তারা বংশবৃদ্ধি করুক।' তারপর, যেখানেই তারা বাসা বেঁধেছে, সেখানেই বংশবৃদ্ধি করে চলেছে তারা। হয়তো পৃথিবীরও যেদিন মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে, হয়তো, সেদিনও আবার ঈশ্বর নিয়ে যাবেন তাদের অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে, বংশবৃদ্ধির প্রয়োজনে।

"যে মন এ কাহিনীর জন্ম দিয়েছে, সে মন যে যথেষ্ট জটিল আর সম্পূর্ণ উন্নত ছিল, সে বিষয়ে দ্বিমত থাকবার কথা নয়। এতে উদ্ভট কল্পনা হয়তো কিছু আছে, কিন্তু তা অর্থহীন নয় নিশ্চয়ই। সে যাই হোক, কাহিনীটা থেকে এ কথা পরিষ্কার যে যে-মানবসমাজকে আজ আমরা জানি, সে-সমাজ হয়তো পৃথিবীর প্রথমতম বুদ্ধিমান জীবের সমাজ নয়। তারপরেও তার অনেক প্রজাতি এসেছে, যারা হয়তো দূর অতীতের নানা মহাপ্রলয়ে গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে।

মধ্য আর দক্ষিণের মানুষের বিশ্বাস, আমরা এখানে আসবার পূর্বকালে পৃথিবী ছিল মাটির আর কাঠের মানুষ অধ্যুষিত। এই কাহিনীরই একটি ভিন্নরূপ রয়েছে সোবিয়েৎ রুশিয়ার বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির লেলিনগ্রাদ গ্রন্থাগারে রক্ষিত আর একটি স্লাভ পুঁথিতে। তাতে বলেছে, আদমেরও আগে একজন মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, 'তার হৃদয় ছিল কাঠের'। এসব কাহিনীর অনেক কাহিনীই হয়তো ধর্তব্য নয়, কিন্তু তাদের ধারণায় যে ধারণা প্রকাশ পেয়েছে, ভুল-ত্রুটি এবং অভিজ্ঞতার ফলই যে ক্রমবিকাশ, আর এ পৃথিবীতে যে সব কিছুই অবিনশ্বর, এ কথা সত্যিই বিস্ময়কর।"

সাইৎসেবের কথাগুলোকে একটু তলিয়ে দেখলে বোধহয়, লাভই হবে। তলিয়ে দেখতে হলে, আরো কিছু আধুনিক গবেষণার দিকে নজর ফেরাতে হয়। তাই করা যাক।

হার্ভার্ডের অধ্যাপক কার্ল সেগান আর মস্কোর স্টার্নবার্গ্ ইনস্টিট্যুটের দিমিত্রি মার্তিনভ চাইছেন শুক্রগ্রহকে জয় করতে মানুষের প্রয়োজনে। দুজনকারই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধারা এক এবং উদ্দেশ্যও এক।

রুশ 'সন্দ্' আর মার্কিন 'মেরিনারের' প্রতিবেদন থেকে জানা যায় শুক্রপৃষ্ঠের তাপ ওঠা-নাবা করে ৪০০° থেকে ৫৩০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের ভেতর। আবহচাপ ৫০ থেকে ৭০। আবহমণ্ডলে কার্বন-ডাইঅক্সাইড আছে শতকরা ৯৩ থেকে ৯৭ ভাগ, নাইট্রোজেন শতকরা ২ থেকে পাঁচ ভাগ আর অক্সিজেন ০.৪ ভাগ আর জলের পরিমাণ এক 'অ্যাট্‌মস্ফিয়ার' চাপে প্রতি লিটারে ৪ থেকে ১১ মিলিগ্রাম।

এইসব হাঁড়ির খবর নিয়ে মার্তিনভ আর সেগান ভাবছেন শুক্রগহের অন্দরমহলের কপাট খোলার কথা। সেগানের ধারণা, আগামী বিশ-তিরিশ বছরের ভেতরেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মালবাহী আকাশযানে করে হাজার হাজার টন 'নীল সমুদ্রশৈবাল' (blue algae) নিয়ে গিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হবে শুক্রের আবহমণ্ডলে। সে সমুদ্র-শৈবাল প্রচণ্ড উত্তাপেও বেঁচে থাকে। শৈবাল দেহের বিপাক ক্রিয়ায় আবহমণ্ডলের কার্বন-ডাইঅক্সাইডের মাত্রা যাবে কমে, গ্রহ-পৃষ্ঠের তাপও কমতে কমতে নেবে যাবে ১০০° ডিগ্রির নিচে। পৃথিবীর আদিম বাতাবরণে একদিন যে ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটেছিল, শুক্রের বাতাবরণেও সেই বিক্রিয়া ঘটাবে নীল সমুদ্রশৈবাল। আলো এবং জলের সাহায্যে কার্বন-ডাইঅক্সাইড কণাগুলো রূপান্তরিত হবে অক্সিজেন কণায়। আর, নীল সমুদ্রশৈবাল শুক্রপৃষ্ঠের উত্তাপকে ১০০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে নাবিয়ে দিলেই শুক্রের বুকে নাববে মহাপ্রলয়ের বন্যার মত আকাশ-ভাঙা প্রচণ্ড বৃষ্টি। তারপর সে গ্রহের আদিম জীবনের সকল প্রয়োজন মেটাবে আলো, জল আর অক্সিজেন। রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে শাপমুক্ত হবে পাষাণী অহল্যা।

এই আপাত অসম্ভব ব্যাপারটি সম্ভব করতে চলেছি আমরা— অর্থাৎ ছায়া-পথপ্রান্তের এক দীন সূর্যের তৃতীয় গ্রহের মানুষেরা। খোদার ওপর এখানে খোদকারি করতে আমরাই পারি। আমরাই যে এ তল্লাটের তৃতীয় পাণ্ডব। তাহলে, আমরাই যদি এ অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারি, মহাবিশ্বের অন্য কোন গ্রহের উন্নততর জীবেরা আমাদের পৃথিবীর বুকেও অমনিতরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিল কোন এক দূরতম

অজানা অতীত দিনে, একথা ভাবতে দোষ কি?

২৭শে আগস্ট ১৯৭৩ আনন্দবাজার পত্রিকায় দু'জন সর্বাধিক খ্যাত আণবিক-জীববিজ্ঞানীর গবেষণা সংক্রান্ত প্রতিবেদন বেরিয়েছিল। তাঁরা হলেন, ডঃ ফ্রান্সিস্ ক্রিক্ এবং ডঃ লেসলি ওরগেল্।

আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখেছেন— 'জীবনের আদি অভ্যুদয় এ পৃথিবীতে ঘটেনি, বরং সূক্ষ্মতম জীবনকণারূপে সে একদা উড়ে এসেছিল মহাকাশ থেকে— লক্ষ-কোটি বছর ধরে অনন্ত আকাশে সে বিচরণ করে। এবং অবশেষে সে এই পৃথিবীর মাটিতে তার আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে।...শত-সহস্র আলোকবর্ষ দূরে আরো কত কোটি সূর্য— সে সকল সূর্যের অসংখ্য গ্রহরূপী কোন এক পৃথিবী থেকে একদা আমাদের পৃথিবীর দিকে জীবনকণা "পাঠানো" হয়েছিল।

'এ পৃথিবীতে জীবন ছিল না, জীবনের সম্ভাবনাও ছিল না। যুগ-যুগান্তের বন্ধ্যা এ পৃথিবী সেদিনই জীবনের প্রথম স্ফুলিঙ্গ দেখে চমকে উঠলো, যেদিন আমাদের ছায়াপথনিবাসী অপর কোন সভ্যতা থেকে একখানা মহাকাশযান বোঝাই করে নীল-সবুজ সমুদ্র-শৈবাল বা অন্য কোন সূক্ষ্মতম জীবনকণা পৃথিবীর তটে পৌঁছে দেওয়া হল।

'আমাদের ছায়াপথের অন্যত্র উন্নততর সভ্যতার বিকাশলাভ সম্ভবপর ছিল না, কেননা, ছায়াপথের বয়স ১৩০০ কোটি বছর। কিন্তু পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাবের মুহূর্ত থেকে বর্তমান প্রযুক্তির যুগে পৌঁছতে লেগেছে মাত্র ৪০০ কোটি বছর। অতএব, ছায়াপথের প্রথম ৯০০ কোটি বছরের জীবনে অন্যত্র, অন্য কোন সূর্যের গ্রহে সভ্যতার বিকাশের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। সে সভ্যতার মানুষেরা হয়তো একদা "ফ্রিজে" রাখা সমুদ্র-শৈবাল বা অন্য কোন সূক্ষ্মতম জীবনকণা মহাকাশযানে তুলে দিয়ে তাকে এক অতি দীর্ঘ মহাকাশ যাত্রায় পৃথিবীর দিকে পাঠিয়েছিল।

'...এমন বহু সাক্ষি-প্রমাণ রয়েছে, যা দেখে মনে হয় পৃথিবীর প্রাণীকুল তাদেরই বংশধর, সুপ্রাচীন যুগে যাঁরা গ্রহে গ্রহান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পৃথিবীর প্রতিটি জৈবিকসত্তা "মলিব্‌ডেনাম্" ধাতুর ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল, যদিও পৃথিবীতে এই ধাতুর প্রাচুর্য নেই।

'যেহেতু গ্রহের রাসায়নিক গঠনের প্রতিচ্ছবিরূপেই গ্রহবাসীদের জৈবিকসত্তা গড়ে ওঠে, সেই জন্যেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, জীবনের আদি উৎস সেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানে "মলিব্‌ডেনামের" প্রাচুর্য আছে। সে স্থানটি অবশ্যই ছায়াপথের কোথাও, পৃথিবীতে নয়।

'ক্রিক্ এবং ওরগেল অন্যদিক থেকেও সমস্যাটি বিচার করেছেন। সেটি জেনেটিক কোড বা বংশানুক্রমিকতা সূত্র।

'সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বহু বিচিত্ররূপে প্রকাশিত-বিকশিত জীবন তার বংশরক্ষার ওই সর্বজনীন সূত্রটি পেলো কোথা থেকে? লক্ষ বা কোটি বছর আগে একটি আদি বীজই তা পৃথিবীতে বহন করে এনেছিল এবং সেই জন্যই পৃথিবীর সূর্যলোক, ছায়াপথ এবং ছায়াপথে পরিব্যাপ্ত আরো কত না পৃথিবী অনাদি থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত এক সার্বজনীনতার বন্ধনে বাঁধা রয়েছে।'—অতএব, প্রায় স্থির সিদ্ধান্তেই এসে পড়েছি। অর্থাৎ এ গ্রহের মানুষ সম্পূর্ণভাবে বহির্বিশ্ব থেকেই আমদানী, কিংবা বিবর্তনকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ত্বরান্বিত করার ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল এ গ্রহের মানুষ।

এ প্রসঙ্গে মায়াপুরাণ, 'পোপোল ভু'-এর কাহিনী শুনতে বোধহয় ভালোই লাগবে।

''ব্রহ্মাণ্ড তখন নিস্পন্দ, নিথর। না নিশ্বাস, না শব্দ। পৃথিবী নিস্তব্ধ, নিঝুম। আকাশে নিঃসীম শূন্যতা। তাঁরা ঘোষণা করলেন, 'পৃথিবী'। সেই প্রথম বাণী, প্রথম দৈববিধান।...জন নেই, প্রাণী নেই, পাখি নেই, মাছ নেই, নেই গাছ, পাথর, খানা, খন্দ। তৃণ নেই, নেই অরণ্য। পৃথিবীর মুখ তখনো অবগুণ্ঠনে ঢাকা। শুধু ছিল অমৃত-সমুদ্র আর অনন্ত-বিস্তার আকাশ। সুসম্বদ্ধ, সুসংলগ্ন ছিল না কোন বস্তু, উদ্গীত হয় নাই কোন বাণী, স্পন্দন তরঙ্গিত হয়নি কোন খানে। আকাশ ছিল স্তব্ধ, শব্দহীন। বিমূর্ত ছিল সর্বচরাচর। শুধু ছিল জল— নিষ্প্রাণ, স্তব্ধ অমৃত সমুদ্র। আর সব কিছু ছিল অবিদ্যমান। নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ ছিল অন্ধকার তমসা...।

''অনন্ত স্রষ্টার বাণী ধ্বনিত হল দিকে দিগন্তরে, 'পূর্ণ হোক মহাশূন্য। অপ, অপসৃত হও, পৃথিবীর প্রকাশ হোক, মাটি হোক দৃঢ়।' তাঁরা বললেন, 'এসো আলো, উদ্ভাসিত হোক মহাকাশ, আলোয় আলোকময় হোক পৃথ্বী।...মানুষের আবির্ভাব না হলে বিকশিত হবে না সৌন্দর্য, প্রকাশিত হবে না মহিমা!'

''তারপর সৃষ্টি করলেন পৃথিবী। এ পরম সত্য কথা। পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তাঁরাই। তাঁরা বললেন, 'পৃথিবী'। জেগে উঠলো পৃথিবী পলকে। ধূলি, কুহেলী, মেঘ অপসৃত হল, প্রকাশিত হল সৃষ্টি।

''তারপর স্রষ্টা 'ৎসাকোল' আর বিশ্বকর্মা, 'বিতো' আরম্ভ করলেন পৃথিবীকে জনপূর্ণ করতে জীব দিয়ে। সে জীবের মুখে কথা ফুটলো না, স্বজন-বন্ধুর নাম ধরে ডাকলো না তারা। স্রষ্টা বললেন, তোমরা পারবে না। তোমাদের খাদ্য হবে তৃণ। খানা-খন্দ, অরণ্য-প্রান্তর হবে তোমাদের বাসভূমি। অন্য জীবের ভক্ষ্য হবে তোমরা, এই তোমাদের নিয়তি।

"তারপর গড়লেন মানুষ, মাটি দিয়ে। কিন্তু সেও হল না মনোমত। বড় নরম সে, জলে গলে যায়, শক্তি নেই দেহে। কথা ফুটেছে, কিন্তু বিচারশক্তি কই? ধ্বংস করে ফেললেন তাদের।

"তারপর গড়লেন কাঠের মানুষ। আকৃতি তাদের মানুষের, মানুষেরই মত কথা তাদের মুখে। বংশবৃদ্ধি করলো তারা, সবই হল। কিন্তু তাদের হৃদয় নেই, নেই কৃতজ্ঞতা, নেই বিচারশক্তি। স্রষ্টার কথা তারা ভুলে গেল। চার পায়ে হাঁটতো তারা। তারাই পৃথিবীর প্রথম মানুষ। আকাশের আত্মার কথা তারা মনে রাখেনি। দেহ তাদের শুষ্ক। মাংসহীন, রক্তহীন তারা। মহাপ্রলয় ডেকে সে সৃষ্টি ধ্বংস করে ফেললেন তাঁরা। বাঁদরেরা নাকি তাদেরই বংশধর। বনে-জঙ্গলে বৃক্ষ শাখায় তাদের বাস। তাই তাদের আকৃতি মানুষের মত, কিন্তু সে-মানুষ কাঠের পুতুল বৈ আর কিছু নয়।

"তারপর সৃষ্টি করলেন নতুন মানুষ যব দিয়ে— সাদা আর হলুদ-বরণ যব দিয়ে। পৃথিবীর শাসক হল তারাই। তাদের দৃষ্টি ছিল প্রখর তীক্ষ্ণ। যেখানে যা কিছু আছে, সব ছিল তাদের দৃষ্টির গোচরে। পৃথিবীর কোথায় কী লুকিয়ে আছে, কোথায় কী ঘটছে, সব তারা দেখতে পেতো ঘরে বসে। প্রগাঢ় ছিল তাদের জ্ঞান। সত্যিই বিস্ময়কর ছিল তারা।

"দেবতারা বললেন, 'একটু ঘুরে ফিরে নিক ওরা, আপন ইচ্ছে মত। যা দেখছি, ঠিক হয়নি। আমাদের মত জ্ঞান, আমাদের মত দৃষ্টিশক্তি ওদেরও থাকলে তো চলবে না।' তাই তাদের চোখের ওপর, মনের ওপর ঈষদচ্ছ একটা আবরণ ফেলে দিলেন দেবতারা। সেই থেকে তাদের সেই প্রখর দৃষ্টিশক্তি, সেই তীক্ষ্ণ বোধশক্তি, সেই প্রগাঢ় জ্ঞান হারিয়ে গেল। এমনি করেই সৃষ্টি করেছিলেন আমাদের আদি পিতাদের আকাশের দেবতারা।"

কাহিনী কিম্বদন্তীতে কল্পনার কিছু চড়া রং হয়তো থাকে। বীজ না থাকলে যেমন মহীরূহ সম্ভবে না, কল্পনা করতে গেলেও তেমনি কিছু বাস্তব ভিত্তি থাকেই। প্রাচীন ঋষিকুল দেবতাদের কাছে মাথা নত করেছেন তাঁদের জ্ঞান, বিজ্ঞান ইত্যাদি সমস্ত সম্পদের জন্যে। আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছেন সেই দেবতাদের কাছেই। দেবতা আজো সুপ্রতিষ্ঠিত আমাদের চেতনার গভীরে। কিন্তু, কেন? আমাদের অচেতন-মনের পটে কি অক্ষয় অক্ষরে লেখা আছে, আমাদের ঠিকানা ওই দূর অনন্তবিস্তার আকাশেরই মাঝে কোথাও?

মাঝ আকাশের দেশ

মাইক্রোনেশিয়ার দ্বীপমালার বৃহত্তম গোষ্ঠী ক্যারলীন দ্বীপপুঞ্জ। এ গোষ্ঠীর বৃহত্তম দ্বীপ পোনাপে। তার আয়তন ১৮৩ বর্গমাইল। জনসংখ্যা ১৮০০০। আবহাওয়া প্রচণ্ড গরম। দ্বীপের বেশির ভাগটাই পাথুরে এবং বসবাসের অযোগ্য। পোনাপেকে বেড় দিয়ে আছে ছোট-বড় আরো কত দ্বীপ, আর আছে প্রবাল প্রাচীর।

প্রতিবেশী খুদে দ্বীপগুলোর একটা তেমুয়েন। এই তেমুয়েনেই আছে সারা দ্বীপ জুড়ে নান্ মাদোলের বিশাল ধ্বংসাবশেষ। নান্ মাদোলের দৌলতেই দ্বীপটির খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি। স্থানীয় লোকের মুখে দ্বীপের নামও নান্ মাদোল সেই কোন্ আদিকাল থেকে। নান্ মাদোলের এ ধ্বংসাবশেষ সুপ্রাচীন কালের, কিন্তু তার প্রাগৈতিহাসিক স্থাপত্যবিন্যাসের কাল আজো অনির্ণীত। কারা ও-বস্তু গড়েছিল তাও অজ্ঞাত।

নান্ মাদোল কালো আগ্নেয়-শিলার শহর— দেবস্থান আর প্রাগিতিহাসের মানুষের আবাসস্থল, নিভৃত আশ্রয়। চারদিকটা একবার ঘুরে ভালো করে দেখে নিলেই ধ্বংসাবশেষের বিশৃঙ্খলার ভেতরেও ভিতের নকশাটা পরিষ্কার চোখে পড়ে। পাথরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অসংখ্য 'কড়ি' গাদা করা রয়েছে একের পর এক। ব্যাপারটা সোজা নয়। কড়িগুলো সব কালো আগ্নেয়শিলার, ওজনও টন-টন। পণ্ডিতেরা বলেন, 'লাভা' জমে গিয়ে অমন কড়ির মতন হয়েছে। কথাটা কি বিশ্বাসযোগ্য? প্রশ্ন করেছেন ডঃ এরিখ ফন দানিকেন। লাভা জমে গিয়ে সব ছ'কোণা আটকোণা কড়ি হয়ে গেল? আর লম্বায় সবগুলোই প্রায় একমাপের?

বাস্তবিক পক্ষে ও থামগুলো পোনাপের পশ্চিম উপকূল থেকে কেটে বের করা হয়েছিল বলে, লাভা জমে সব একমাপের থাম বা কড়ি হয়ে যাওয়ার গপ্পো ফেলে মানতে বাধ্য হতে হয় যে, বাড়ি তৈরীর এমন নিখুঁত করে গড়া চমৎকার উপাদান খনি থেকে কেটে তুলে উত্তর উপকূলেই চাঁছা-ছোলা হয়েছিল। থামগুলো ১০ ফুট থেকে ২৯ ফুট পর্যন্ত লম্বা আর ওজনে দশ টনেরও বেশি। তাদের নিশ্চয়ই বয়ে আনা হয়েছিল পোনাপের উত্তর উপকূল থেকে, জঙ্গলাকীর্ণ খালের গোলকধাঁধার ওপর দিয়ে, বারো-চোদ্দটা একই ধরনের বাসোপযোগী দ্বীপ পেছনে ফেলে, এই নান্ মাদোলে। দ্বীপের ওপর দিয়ে তাদের বয়ে আনার প্রশ্নই ওঠে না, কেননা সেই সুদূর অতীতেও ওই জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় দিনে অনেকবার প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে, তাছাড়া

পোনাপে দ্বীপটা পাহাড়ী। তবু যদি ধরা যায় যে, জঙ্গলের ভেতর দিয়েই পথ কাটা হয়েছিল, আর পাহাড় ডিঙিয়ে, জলা ভেঙে মাল বহন করবার ব্যবস্থাও ছিল সেকালে, তাহলেও দ্বীপের অগ্নিকোণ বরাবর এনে তাদের জাহাজে তোলা হয়েছিল।

স্থানীয় লোকেরা বলে, ও কড়িগুলো বয়ে আনার সমস্যা সহজেই সমাধান করা যেতো, যদি ভেলা ব্যবহার করা হত। আরো একটা সমাধানের কথা শোনা যায়, আদি বাসীরা নাকি ওগুলো এনেছিল তাদের ডিঙিতে বেঁধে ঝুলিয়ে, ফলে পাথরের ওজনও কমেছিল জলের নিচে থাকার দরুন। কথাটা ভেবে দেখতে হয়। প্রধান বাড়িটার আয়তন অনুযায়ী হিসেব করলে দেখা যায়, সে আয়তন ভরতে লাগা উচিত ৩২০০০ থাম। সে বাড়ি পুরো স্থাপত্য বিন্যাসের একটা ছোট অংশমাত্র।

নান্ মাদোলে খাল আছে, পরিখা আছে, সুড়ঙ্গ আছে আর আছে একটা ৮৭৫ গজ লম্বা পাঁচিল, তার উচ্চতম স্থানটির মাপ সাড়ে ছেচল্লিশ ফুট। সামনের চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণটি নিখুঁত বর্গক্ষেত্রাকার আগ্নেয়শিলায় বাঁধানো। প্রধান অট্টালিকার বহির্বাটিকার সংখ্যা ৮০টা, অর্থাৎ এখানেই থাম লাগবে, ৪০,০০০,০০০ খানা।

কোন ব্যাখ্যাকে ভুল প্রতিপন্ন করতে একটা মোটা হিসেবই সাধারণতঃ যথেষ্ট। যেমন ধরুন, নান্ মাদোলের এই অট্টালিকা শ্রেণী যখন তৈরী হয়েছিল, তখন আজকের তুলনায় পোনাপের লোকসংখ্যা ছিল অনেক কম। খনি থেকে পাথর কাটার কাজ কষ্টকর শ্রমসাধ্য এবং বিরক্তিকর ছিলই। চাঁছা-ছোলা পাথরকে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বয়ে আনতে লেগেছিল বিরাট একদল তাগড়া জোয়ান লোক। তারপর সমুদ্রতীরে পাথরের সে কড়িগুলোকে ডিঙিতে বেঁধে ঝোলাতে লেগেছে আরো অনেক লোক। তাছাড়া আরো কত লোক লেগেছে নারকোল পাড়তে, মাছ ধরতে, তথা দৈনন্দিন আহারের ব্যবস্থা করতে। তাই, প্রতি চতুর্থ দিনে যদি বেশ কয়েক টন করে পাথরের চাঙড় এসে থাকে দক্ষিণ উপকূলে নান্ মাদোলে নিয়ে যাবার জন্যে, সে যুগের প্রাযুক্তিক কৌশল খাটিয়ে, তাহলে তাকে বিরাট বিস্ময়কর কাজ বলতেই হবে। এ হিসেবে, যদি বছরে ১৪৬০ খানা থামকে নান্ মাদোলে বয়ে আনা হয়ে থাকে, তাহলে বাড়ি তৈরীর উপকরণ জমিতে এনে ফেলতেই লেগেছে ২৯৬ বছর।

মানুষ কোনকালেই বেফায়দা এমন কষ্ট স্বীকার করতে রাজী ছিল না। পোনাপের উত্তর উপকূলেই যখন আগ্নেয়শিলার খনি ছিল তখন নান মাদোলে না গিয়ে ওখানেই কেন বাড়িঘর ফাঁদলো না?

নান্ মাদোল শহর সুন্দর নয় কোন দিক দিয়েই, ছিলও না কোন কালে। কোন ভাস্কর্য নেই, নেই রিলিফের কাজ, মূর্তি নেই, ছবিও নেই। স্থাপত্য রসকষহীন, নিষ্প্রাণ। পাথরের কড়িগুলো একটার ওপর আর একটা চাপানো রয়েছে শুধু, তাতে না আছে রূপ না আছে ছন্দ। কেমন যেন রুক্ষ, ভীতিজনক। অথচ দক্ষিণ সমুদ্রের অধিবাসীরা চিরকাল তাদের প্রাসাদ, তাদের দুর্গ, সব অলঙ্কৃত করেছে অপূর্ব সুষমায়। সে প্রাসাদ, সে দুর্গ গড়া হত রাজন্যবর্গের সম্মাননার প্রয়োজনে, না হয় দেবতাকে খুসী করতে। নান্ মাদোলের এ রুক্ষ স্থাপত্য, এ দুটোর কোনটার প্রয়োজনেই গড়া হয়নি। তাহলে কি সেটা গড়া হয়েছিল প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে? কিন্তু বাড়িগুলোতে যে সহজেই চড়া যায়। তাহলে তো প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে না। শত্রুর জন্যে এত সহজ ব্যবস্থা কেউ কোনকালে করবে না। আসলে, সারিবদ্ধ গৃহশ্রেণী গোটা পরিকল্পনা-বিন্যাসের, কেন্দ্রের দিকে চলে গেছে, চলে গেছে একটা কূপের দিকে।

কূপ নয় সেটা। সেটা একটা সুড়ঙ্গের প্রবেশ পথ, না হয় বহির্দ্বার। কূয়োর মুখের ছ'ফুট পর্যন্ত জলে ভরা দেখে কিছুই বোঝা যায় না, কারণ নান্ মাদোলের বাড়িগুলো চলে গেছে দ্বীপের কিনারা পর্যন্ত। সাদা চোখে দেখা যায়, সমুদ্রের অনেক নিচে নাবতে নাবতে জলের তলায় তলিয়ে গেছে।

কিন্তু ওই ছোট্ট দ্বীপে সুড়ঙ্গ কেন? কোথায়ই বা গেছে ও সুড়ঙ্গ?

হার্বার্ট রিটলিঙ্গার তাঁর 'অপরিমেয় মহাসমুদ্র' নামের গ্রন্থে লিখেছেন, পোনাপেতে তিনি শুনেছেন, হাজার হাজার বছর আগে একটা বিশাল, বিরাট রাজ্যের কেন্দ্র ছিল পোনাপে। প্রকাণ্ড ধনরত্নের গুজবে মুক্তো-ডুবুরীরা প্রলুব্ধ হয়েছে, প্রলুব্ধ হয়েছে চীনা বণিকেরাও। তারা গোপনে পরীক্ষা করেছে সমুদ্রতল। ডুবুরীরা উঠে এসে বলেছে নানা অবিশ্বাস্য কাহিনী। বলেছে, জলের তলায় রয়েছে এখনো সুরক্ষিত সুবিন্যস্ত পথশ্রেণী, ঝিনুক আর প্রবাল পল্লবে ঢাকা। সে পথ দিয়ে তারা হেঁটে বেড়িয়েছে। বলেছে, সমুদ্রের নিচে রয়েছে পাথরের অসংখ্য খিলেন, আর রয়েছে সুন্দর স্তম্ভশ্রেণী, আর একশিলা স্তম্ভ। পরিষ্কার চেনা যায় এমন সব বাড়ির ধ্বংসাবশেষের ওপর রয়েছে খোদাই করা প্রস্তরফলক।

মুক্তোডুবুরীরা যা পায়নি তা আবিষ্কার করেছিল জাপানী ডুবুরীরা আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে। পোনাপের পৌরাণিক কাহিনীর সমর্থন মেলে জাপানীদের আবিষ্কারে। কাহিনী বলে, সেখানে আছে প্রচুর মূল্যবান ধাতু আর রূপোর বাট, আর আছে প্রচুর

মুক্তো। মৃতদেহ রক্ষিত আছে প্লাটিনামের জলরোধক শবাধারে।— জাপানী ডুবুরীরা সত্যিই তুলে এনেছে প্লাটিনামের টুকরো দিনের পর দিন। দ্বীপের প্রধান রপ্তানি নারকোল, ভ্যানিলা, সাবু আর শুক্তির স্থান দখল করেছিল প্লাটিনাম। রিটলিঙ্গার বলেছেন, প্রাচীন কিম্বদন্তীর সর-পড়া স্থানীয় কাহিনীতে অতিরঞ্জন সম্ভবতঃ আছে, কিন্তু যে দ্বীপের পাথরে প্লাটিনামের গন্ধও নেই, সেখানে যে প্লাটিনাম পাওয়া গেছে, সে কথা তো মিথ্যে নয়।

প্লাটিনামের কথা যেমন-তেমন, কিন্তু ডুবুরীদের বাড়িঘর, পথঘাট, পাথরের খিলেনের গপ্পো আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, কেননা, দ্বীপের কিনারায় দাঁড়ালে জলের তলায় যে ও-সব দেখা যায়, পরিষ্কার বোঝা যায় কেমন ভাবে সেগুলো তথাকথিত কূপ পর্যন্ত চলে গেছে! আমার ধারণা, এ কূপ দ্বীপের নিচেকার কোন গৃহশ্রেণীর প্রবেশপথ। একটা কথা, প্লেটোর বর্ণিত ৯০০০ খৃস্ট পূর্বাব্দে তলিয়ে যাওয়া অতলান্তিসের সঙ্গে নান্ মাদোলের কোন সম্পর্ক নেই। এখানে শুকনো জমির ওপর যে বাড়িঘর নির্মিত হয়েছিল, তা এখনো বিদ্যমান, তাছাড়া সে নির্মাণকর্ম যে জলের তলায়ও প্রসারিত হয়েছে, তাও নির্মাতাদের পরিকল্পনা মোতাবেক এবং একই সময়ে তৈরী।

নান্ মাদোলের রহস্যময় ধ্বংসাবশেষকে ঘিরে কাহিনী কিম্বদন্তীও কম নেই। কিম্বদন্তী বলে, নান্ মাদোলের প্রতীক ছিল অগ্ন্যুদগারী ড্রাগন। ওই ড্রাগনকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে দ্বীপ এবং গৃহাদির উৎপত্তির গল্প।

ড্রাগনের মা তার ছুঁচলো কঠিন মুখ দিয়ে আল কেটে কেটে গড়েছিল, ওই দ্বীপমালা। ড্রাগনের সহকারী ছিল এক জাদুকর। সে জানতো এক মন্ত্র, আর সেই মন্ত্রের বলেই সে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের কড়িগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে আসতো পাশের দ্বীপ থেকে, গড়ে তুলতো ঘরবাড়ি দরদালান। নান্ মাদোলের মানুষকে কুটোটিও নাড়তে হত না।

দক্ষিণ সমুদ্রের যে সব দ্বীপে প্রাচীন বাড়িঘরের ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান, সে-সব দ্বীপের কাহিনী-কিম্বদন্তীতেও রয়েছে তাদের কথা। কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত কথা হল, সব কাহিনীতেই রয়েছে, বাড়িঘর তৈরীর পাথরের 'উড়ে' আসার বিবরণ। সে-সব ঘটনা-বিবরণের সেরা হল ইস্টার দ্বীপের কাহিনী। রাপানুইএর গল্পে-গাথায় বংশানুক্রমে নেবে এসেছে যুগ যুগ ধরে সেই কথা। সমুদ্রোপকূলে দণ্ডায়মান দু'শোটা

পাহাড় প্রমাণ মূর্তি 'আকাশ থেকে উড়ে এসে' দাঁড়িয়ে পড়েছিল 'আপনা-আপনি' যে যার জায়গাটিতে।

উদ্ভট কল্পনা করতে গেলেও একটা বাস্তব ভিত্তির প্রয়োজন হয়ই। ঘোড়া, বাস্তবেরই হোক অথবা কল্পনারই হোক, ছোটাতে গেলে শক্ত মাটি চাই-ই। একটা আপাত 'মায়াপুরীর' কথাই যখন হচ্ছে, তখন মানুষের কল্পনায় তার অভিজ্ঞতার ছাপ পড়বেই, নিদেন কল্পনা করার মুহূর্তে দেশ-কালের প্রভাবও পড়বে।

সারা পৃথিবীর কাহিনী-কিম্বদন্তী জুড়ে বসে আছে অবিশ্বাস্য শক্তিধর ড্রাগন। প্রাচীনতম চীনা গাথায় আছে ড্রাগন, মায়াপুরাণেও সে তার স্থান করে নিয়েছে স্বাভাবিক কারণেই। অগ্ন্যুদ্‌গারী এ দানবের দাপট দক্ষিণ সমুদ্রের সমস্ত আদিম মানুষেরই পরিচিত, কখনো বা সে-দানব নিয়েছে ঘন শব্দকারী উড্ডীন সর্পের রূপ। কিন্তু সর্বত্র সে দানবকুল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুর্ভর বোঝা ঘাড়ে করে দূর দূরান্তে পাড়ি দিতে সমর্থ, শুধু তাই নয়, পূর্ব পরিকল্পনামত সে-বোঝা সে ঠিক জায়গায় সাজিয়ে দিতেও পটু।

পলিনেশিয়া সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের বেশিরভাগই একমত যে, দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপসমূহে ভাষা এবং সংস্কৃতি ছড়িয়ে গেছে পূর্ব পলিনেশিয়া থেকে।

'এসব বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্তকে', দানিকেন বলেছেন, 'ছোট করবার সাহস আমার নেই, তবে গোটা কতক প্রশ্ন আমার আছে।'

পূর্ব পলিনেশিয়ার মানুষ তাদের সংস্কৃতি বেসাতি নিয়ে দূর-দূরান্তের দ্বীপসমূহে কেমন করে পাড়ি দিত? তারা নাকি ডিঙি বেয়ে সমুদ্র-স্রোতে গিয়ে পড়তো, তারপর ভাসতে ভাসতে চলে যেতো। কিন্তু ভাসতে ভাসতে কোথায় যেতো? চলে না হয় যেতো। ফিরে কি আসতো না? ঘরে ফেরার প্রশ্ন কি ছিল না? অসীম শক্তিশালী মানুষের পক্ষেও যে সম্ভব নয় প্রতিকূল স্রোতে ডিঙি বেয়ে আসা।

'আমি বলি' দানিকেন বলেছেন, 'পূবের মানুষ পশ্চিমে যাতায়াত করতো আকাশপথে উড়ে। আমি বিশ্বাস করি, পলিনেশিয়ার আদিমতম মানুষ নিশ্চয়ই উড়তে পারতো।

'যদি বলি, পলিনেশিয়ার মানুষদের পূর্ব-পুরুষের গুরুরা এসেছিলেন মহাকাশের কোন অত্যুন্নত প্রাযুক্তিক সভ্যতাসম্পন্ন জগৎ থেকে, তাহলে বলতে হবে আমার স্পর্ধা সত্যিই মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে— অবশ্য, তেমন কথা যদি দক্ষিণ সমুদ্রের মানুষদের

পুরাণে-কাহিনীতে থাকে, তাহলে অমন কথা নিশ্চয়ই কেউ বলবেন না।' (বীজ ও মহাবিশ্ব)।

আছে অমন কথা। রঙ্গামাই পুরাণে আছে উপজাতি যুদ্ধের কথা। হেরে যাবার ভয়ে ঙ্গা-তি-হাউ উপজাতি আশ্রয় নিল এক সুরক্ষিত, নিরাপদ গ্রামে। সেখানেও যখন আক্রমণ এড়াতে পারলো না, তখন ঙ্গা-তি-হাউ যোদ্ধারা করুণা ভিক্ষা করলো রঙ্গামাই দেবতার কাছে। দেবতা এলেন, তখন বেলা দ্বিপ্রহর, সূর্য মাথার ওপরে।

'রূপ তাঁর উজ্জ্বল তারার মত,
জ্বলন্ত অগ্নির মত, সূর্যের মত।'

রঙ্গামাই দেবতা গ্রাম-প্রাঙ্গণে উড়ে এসে নাবলেন—

'ধরিত্রী চমকিত হইলেন,
ধূলিমেঘে দিক্-দিগন্ত আচ্ছন্ন হইল,
বজ্রধ্বনি আকাশ মথিত করিল,
তারপর উত্থিত হইল ঝটিকা-স্বনন।'

তাহাকি পুরাণে বলে, কুমারী হাপাই পৃথিবীতে এসেছিলেন সপ্তম স্বর্গ থেকে, সুকান্ত এক মানবসন্তানের সঙ্গে রাত্রি যাপন করতে, সে কুমারী কার মেয়ে, কোথাকার মেয়ে, জানতো না সে মানবস্থান। তারপর যখন সে গর্ভবতী হল, তখনই সে জানালো তার আসল পরিচয়। জানালো, সে এসেছে দূর আকাশের এক গ্রহ থেকে। সে দেবী। হৃত কৌমার্য হাপাই আবার ফিরে গেল আকাশে, একটি কন্যা সন্তান ভুমিষ্ঠ করে।

নিউজিল্যান্ডের এক পুরাণ কাহিনী। যোদ্ধা ভয়েনুকু সমুদ্রতীরে বেড়াতে গিয়ে দেখলো বেলাভূমির ওপর কুয়াশার একটা মস্ত স্তম্ভ ভাসছে যেন। বুকে সাহস নিয়ে সে এগিয়ে গেল সেই অপচ্ছায়ার পানে। গিয়ে দেখে, সেখানে অপরূপ রূপবতী দু'টি কুমারী কন্যা আকাশ থেকে নেবে এসে সমুদ্রে স্নান করছে। রূপমুগ্ধ বীর শ্রদ্ধাবনত হয়ে কন্যাদের অভিবাদন করে একজনকে জানালো আমন্ত্রণ।

'ওগো কন্যা, আমার ঘর আলো করবে চলো, আমার বধূ হয়ে ধন্য করবে আমাকে।' রূপবতী আকাশ-কন্যা বললে, 'এ পৃথিবীকে আমি ভালোবাসি, ওপরের ওই অনন্তবিস্তার আকাশের মত শীতলও নয় এ পৃথিবী, শূন্যও নয় তেমন।'

কী আশ্চর্য কথা! পলিনেশিয়ার সরল মানুষ, আদিম মানুষ জানতো, ওপরের ওই

অনন্তবিস্তার আকাশে আছে শৈত্য, আছে শূন্যতা'?

প্রবন্ধ দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে যাবে, তবু দানিকেনের সব কথা বলা হয়ে উঠবে না। যে ক'টি কাহিনী উদ্ধৃত করেছি, আমার বিশ্বাস, শিক্ষিত পাঠকের কাছে তাদের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। পুরাণসমূহে এই রকম স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লেখা আছে ওড়ার কথা, উড্ডীন যন্ত্রের কথা, অন্য গ্রহের কথা। পুরোন কালের 'মল্লিনাথেরা' এসবের যে টীকা দিয়েছেন তা একান্ত অর্থহীন। আজকের এই নভশ্চারণার যুগের জ্ঞানের ভিত্তিতে যদি কেউ সদ্ব্যাখ্যা যোগাতে প্রয়াসী হন, পণ্ডিত সমাজ চোখে-কানে ঠুলি এঁটে বসে থাকবেন, দেখবেনও না, শুনবেনও না। তাঁরা যে প্রাচীন ব্যাখ্যার ধারক এবং বাহক।

পুরাণ এবং কাহিনী-কিম্বদন্তীর গবেষণা এবং প্রাগৈতিহাসিককাল সম্পর্কিত পুরাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাগুলো মনগড়া ধর্মীয় ধারণার লাল ফিতের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। চোখও দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে, কল্পনাও মৃত। বিজ্ঞান বলে, 'কাল্পনিক' সমাধান অগ্রাহ্য, যেহেতু তাদের প্রমাণ নির্ভর, প্রয়োগসম্ভব ভিত্তি নেই। কিন্তু আজ এসব সম্পর্কিত একান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোও যে উদ্ভট প্রমাণিত হচ্ছে একে একে। আর যত উদ্ভট, যত অবজ্ঞাত কল্পনার ভিত্তিভূমি হয়ে উঠছে দৃঢ় হতে দৃঢ়তর।

ভালো কথা, স্থানীয় ভাষায় নান্ মাদোল শব্দটার অর্থ 'অন্তবর্তী মহাকাশের দেশ'!

'হোরেশিও স্বর্গে ও মর্তে আছে হেন বস্তুচয়,
দর্শনশাস্ত্রের যাহা স্বপ্ন-অগোচর।'

প্রাচীন ভারতের প্রযুক্তি

কথায় বলে, 'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে'। সত্যি, মহাভারতে যে কী নেই, তাই ভাবি। কিন্তু এতাবৎকালে শুনে এসেছি, মহাভারত একটি মহাকাব্য মানে, দেবতাদের (অথবা, দেবাংশজাত নায়কের) কাহিনী নিয়ে লেখা কাব্য। আর দেবতা যখন আছে, তখন ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ধর্মের। ব্যস্, আর কিছু দেখবারও দরকার নেই, শোনবারও দরকার নেই, ভাববার দরকার তো নেইই। বিজ্ঞানীসমাজ তাকে বেমালুম নাকচ করেন, বুড়ো বয়সের পাঠ্য বলে, আর আমার মতন সাধারণ মানুষ হরিসভার আটচালায় বসে ভক্তিগদগদচিত্তে কথকঠাকুরের কথকতা শুনে 'আহা, আহা' করে চোখ মুছি। অজ্ঞানতার এমন নজির বোধহয় দুনিয়ার আর কোথাও নেই। এটাকে ঠিক কুঁড়েমি বলা যায় না, এ হল অবহেলা। বরং, এর নাম দেওয়া উচিত 'হেলালাস্য'— আলস্য এবং অবহেলার সমাহার।

ট্রয় নগরীও ছিল মহাকাব্যের পাতায়, কিন্তু হাইনরিশ শ্লীমান সেই ট্রয়কে মহাকাব্যের ছন্দ-অলঙ্কারের বেড়াজাল থেকে টেনে বের করে পৃথিবীর মানুষের চোখের সামনে ধরে দিলেন। হেনের স্বর্ণাভরণে সাজিয়ে দিলেন শ্রীমতী শ্রীমানকে। আমাদের এ পোড়া দেশে কি একজনও শ্লীমান নেই? এখানকার শ্রীমতী শ্লীমানদেরও পোড়াকপাল, দ্রৌপদীর রত্নাভরণ তাঁদের ভাগ্যে জুটলো না।

সুইস প্রত্নবিৎ, ডঃ এরিখ ফন দানিকেন সারা দুনিয়া চষে বেড়িয়েছেন, এখনো বেড়াচ্ছেন, প্রায়ান্ধকার অতীতের 'দেবতাদের রেখে যাওয়া নানাতরো নজির খুঁজে বের করতে। মাথা ফাটিয়ে ফেলছেন, স্বর্গের সঙ্গে মর্তের যোগাযোগ ব্যবস্থার স্বরূপটিকে উদঘাটন করতে। ছুটে এসেছেন ভারতে, সংস্কৃত পুঁথিসমূহের কথা জানতে। কিন্তু, বেচারা! বিশেষ কিছুই পাননি। পণ্ডিতেরা তাঁকে বিশেষ কোন সাহায্যই করতে পারেননি। পারবেন কেমন করে, তাঁদের চোখের ওপর যে ধর্মের, তথা গোঁড়ামির পর্দা ফেলা আর, মনে আর মগজে ওই, 'হেলালাস্য'। দানিকেন বলেছেন, সেদিন তাঁর মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছিল, সংস্কৃত জানেন না বলে।

দানিকেনের প্রশ্নের জবাব দিতে বোধহয়, রামায়ণ-মহাভারতের খানিকটাই যথেষ্ট।

কুবেরের পুষ্পক রথ সত্যিই হাঁসে টানা রথ ছিল না, সে ছিল প্রকাণ্ড একটা অতি উচ্চ পর্যায়ের আন্তরশক্তিসম্পন্ন বিমান। অত উচ্চ পর্যায়ের এবং অমন প্রকাণ্ড বিমান

বোধহয় আজো আমরা গড়ে তুলতে পারিনি।

পুষ্পক রথের কিছু বর্ণনা দিয়েছেন হনুমান। সে বিমানকে উড়তে দেখি, রামচন্দ্র এবং তার দলবল সমেত লঙ্কা থেকে অযোধ্যার পথে। রামচন্দ্রের আদেশে 'আন্তরতেজসম্পন্ন' পুষ্পক ভীমনাদে আকাশে উড়ে গেল।—'হংসযুক্তং মহানাদমুৎপপাত বিহায়সম্।'—'হংস' কথাটার 'হাঁস' নয়, 'আন্তরতেজ' বা 'আন্তরশক্তি'। বিমানটির আয়তন যে কী বিশাল, তা রামচন্দ্রের সঙ্গে বিমানযাত্রী দলটির কথা ভাবলেই বোঝা যায়। আর সেই 'রথটিকে' লক্ষ লক্ষ হাঁসে টানলেও তাকে আকাশে টেনে তোলা দূরস্থান, নড়াতেও পারতো না। কৃত্তিবাসের পক্ষে বাল্মীকির হংসকে হাঁস বলা একটুও ভুল হয়নি, কেননা, তাঁর পক্ষে উড্ডীন রথের কল্পনা করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু আজকের মানুষও যদি হাঁস বলেন, আর বলবার কিছু থাকে না।

আর একটি বিমানের ব্যাপারে দেখা যাক। অর্জুনকে স্বর্গলোকে নিয়ে যাবার জন্যে ইন্দ্রের রথ এসেছে। রথটি আসলে একটি প্রকাণ্ড যুদ্ধবিমান। বিমানটির বর্ণনা দিয়েছেন ব্যাসদেব—

'এমন সময়ে মহামেঘের শব্দের তুল্য গম্ভীর শব্দে সমস্ত দিক পরিপূর্ণ করিয়া মেঘসমূহকে যেন বিদীর্ণ করিতে থাকিয়া এবং আকাশমণ্ডলকে অন্ধকারশূন্য করিয়া মহাপ্রভাবশালী মাতলিসংযুক্ত ইন্দ্র রথ আগমন করিল।

'সেই রথের ভিতরে ভীষণ তরবারি ও শক্তি, ভয়ঙ্কর গদা, অলৌকিক প্রভাবসম্পন্ন প্রাস, মহাপ্রভাবশালী বিদ্যুৎনির্ঘাতের তুল্য শব্দকারী বজ্র, মহামেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দকারী চক্রসংযুক্ত এবং কেবল বায়ুর সাহায্যে দশ দশ সের ওজনের এক একটি গোলা নিক্ষেপ করে এহেন বৃহৎ কামান, বিশালদেহ ও উজ্জ্বল মুখ ভয়ঙ্কর সর্প এবং বৃহৎ পর্বত শৃঙ্গের ন্যায় রাশীকৃত পাথরের গোলা সকল বিদ্যমান ছিল।

'আর সেই বিমানে বায়ুর ন্যায় বেগশালী অশ্বাকৃতি দশ হাজার চালকযন্ত্র ছিল, যন্ত্রগুলি নয়নাকর্ষক সেই দিব্য বিমানকে বহন করিত।'

তারপর মাতলি অর্জুনকে বিমানে আরোহণ করতে বলায় অর্জুন বললেন,

'তুমি রথে উঠিয়া অশ্বগুলিকে স্থির করিলে পর ওই রথে আরোহণ করিব।

'ইন্দ্রসারথি মাতলি অর্জুনের সেই কথা শুনিয়া সত্বর রথে আরোহণ করিলেন এবং রশ্মি দ্বারা অশ্বগুলিকে সংযত করিলেন।'

মাতলি 'রশ্মি দ্বারা অশ্বগুলিকে সংযত' করলেন। এই ব্যাখ্যায় একটা জিনিস ভারী অদ্ভুত একটু আগে বলা হয়েছে 'অশ্বাকৃতি চালকযন্ত্র'। তা যদি হয়, তাহলে বল্গা (রশ্মি) টেনে অশ্বকে সংযত করার কথাটা হাস্যকর। তাই মনে হয়, 'রশ্মি' মানে সত্যিই কোন রশ্মি যার প্রয়োগে যন্ত্রকে সংযত করা হয়েছিল। আর, অশ্বেরও বোধকরি আরো কোন অর্থ আছে। আধুনিক প্রাযুক্তিক জ্ঞানসম্পন্ন কোন পণ্ডিতের দ্বারাই সম্ভব, প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা। তবে, এটুকু বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, এক্ষেত্রে রশ্মির অর্থ লাগাম নয়, আর অশ্বের অর্থও, ঘোড়া নয়। বিমান আকাশে উড়বে, আবার তাতে ঘোড়াও জোতা থাকবে, ব্যাপারটা যেন কেমন কেমন নয়? অশ্বকে যদি ঘোড়াই বলেন, তাহলে 'বিহায়স্' শব্দের অর্থও আকাশ না করে করুন রাস্তা। ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়াবে,— রথ দাঁড়িয়ে রয়েছে পথের ধারে মাঠের ওপর, রামচন্দ্রের আদেশে সে রথ ঘড় ঘড় করে পথের ওপর উঠে পড়লো। এ অর্থ কেউ যদি মেনে নিতে পারেন, বহুত আচ্ছা!

ঠিক এমনি ব্যাপার আছে নল-দময়ন্তীর কাহিনীতে। দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর ঘোষিত হয়েছে। রাজা ঋতুপর্ণের ইচ্ছে, সে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত থাকেন। বাহুকবেশী নলকে ডেকে বললেন, ভালো ভালো দেখে ঘোড়া বেছে নিয়ে রথে জুততে, যাতে এক 'অহ্নেই' সেখানে পৌঁছোনো যায়। 'অহ্ন' শব্দের প্রকৃত অর্থ, দিবাভাগের এক-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ চার ঘন্টা। বাহুকবেশী নল অশ্ববিদ্যাবিশারদ। অশ্বশালা থেকে চারটে দ্রুতগামী ঘোড়া বেছে নিয়ে রথে জুতলেন।

রথ চলেছে,—

'বাহুক অচিরকাল মধ্যেই আকাশচারী পক্ষীর ন্যায় বহুতর নদী, পর্বত, বন ও সরোবর অতিক্রম করিলেন।'

এমন সময় রাজা ঋতুপর্ণের উত্তরীয়টি গা থেকে খসে পড়ে গেল। রাজা বাহুককে বললেন, 'ঘোড়াগুলোকে একটু থামাও, বার্ষ্ণেয় নেবে গিয়ে উত্তরীয় নিয়ে আসুক।' বাহুক বললেন,

'মহারাজ আপনার উত্তরীয় দূরে পড়িয়াছে। তাহার পর রথ এক যোজন পথ অতিক্রম করিয়াছে, সুতরাং আর তাহা আনিতে পারা যাইবে না।'

রথটি ঘোড়ায় টানা একথা মনে রেখে ওপরের কথাগুলি বিচার করুন। প্রথম কথা, ঋতুপর্ণ উত্তরীয়ের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বাহুক বলেছেন, সে উত্তরীয় ফিরে

পাওয়া সম্ভাবনা নেই, কেননা ইতিমধ্যে রথ এক যোজন পথ অতিক্রম করে গেছে, অর্থাৎ অন্ততঃ আট মাইল পথ অতিক্রম করে গেছে। উত্তরীয়ের পতন, ঋতুপর্ণের সে কথা জানানো এবং বাহুকের জবাব দেওয়ায় মাঝে যদি একটি মিনিট সময়ও কেটে গিয়ে থাকে, তাহলেও রথের গতি ঘণ্টায় প্রায় ৪৫০।৫০০ মাইল হয়।

দ্বিতীয়, চারঘণ্টায় অযোধ্যা থেকে বিদর্ভে যেতে হবে। পথের দৈর্ঘ্য, সরল রেখায়, আটশ' মাইল তো বটেই, গাড়ির পথ আরো কত দীর্ঘ হওয়া সম্ভব, তা পাঠক-সাধারণ বলতে পারবেন। সেই পথ ঘোড়ায় টেনে নিয়ে যাবে চার ঘণ্টায়! এর ভেতর আবার পথে এক জায়গায় দাঁড়াতে হয়েছে। ঋতুপর্ণ বাহুককে দ্রুতগণন শিক্ষা দিয়েছেন। দু'ঘণ্টা সময় লেগেছে সে শিক্ষা দান করতে। তা সত্ত্বেও রথ পৌঁছেছে অযোধ্যা থেকে বিদর্ভে সূর্যাস্তের পূর্বেই, অর্থাৎ মাত্র দু'ঘণ্টার রথ পৌঁছেছে বিদর্ভের কুণ্ডিন নগরে, দূর অযোধ্যা থেকে। রথের গতি ঘণ্টায় ৪৫০।৫০০ মাইল হলেই তা সম্ভব। কেমন ধরনের পক্ষিরাজ ঘোড়া রথে জুতেছিলেন অশ্ববিদ্যাবিশারদ নল?

সতেরো-আঠারো শতকে 'ঘোড়ার ডাক' বসানো হত দূর পথের মাঝে মাঝে। হাওড়া থেকে ষাট-সত্তর মাইল পথ বর্ধমান যেতেই শুনেছি দু'তিন বার ঘোড়া বদলাতে হত। আর, এ তো প্রায় হাজার মাইল পথ। বিমান পথও সরল রেখায় পাতা থাকে না।

এ ক্ষেত্রে একটা কথাই মনে হয়, রাজা ঋতুপর্ণের বিমানটি ছিল চার ইঞ্জিনযুক্ত একটি জেট বিমান, আর সে বিমানের গতি বোঝাবার জন্যেই ব্যাসদেব উত্তরীয় পতনের গল্পটি বলেছেন।

তারপর, নলের সারথ্যে রথ যখন কুণ্ডিননগরের আকাশে পৌঁছেছে, তখন দময়ন্তী 'বর্ষাকালে মেঘ গর্জনের ন্যায় গম্ভীর নলের রথের সেই নির্ঘোষ শুনিতে পাইলেন'।

বাল্মীকি অথবা ব্যাসদেবের শব্দ চয়ন এবং প্রয়োগ যে অত্যন্ত সুচিন্তিত, সে কথা কে অস্বীকার করবে? কার এতবড় বুকের পাটা আছে? অবশ্য, অনেক পণ্ডিতমূর্খের অনেক প্রক্ষেপও মিশে আছে তাঁদের রচনার ভেতরে, সে কথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। 'বানর' শব্দটির উল্লেখ দেখেই যেমন কোন পণ্ডিতমূর্খ 'শাখামৃগ' শব্দটি ঢুকিয়ে দিয়েছেন এবং একবারও ভেবে দেখেননি যে বালি একটি সলাঙ্গুল শাখামৃগ ছিলেন না। তা যদি হতেন তাহলে বালিকে বধ করবার পূর্বে রামচেন্দ্রর মত বীরকে

তাঁর শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে হত না এবং তাঁকে লুকিয়েও মারতে হত না। তবে, সেটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি থাকলে খোদার ওপর খোদকারী করবেন কেন?

ধান ভানতে শিবের গীত এসে পড়লো। না এসে উপায় কি। ওঁদের পাল্লায় পড়ে কুম্ভকর্ণও রাবণের সহোদর হয়েছে। শিকারীরাও তাদের রাইফেলকে ভাই বলে, রাবণও তাঁর দুর্ধর্ষ রোবটটিকে ভাই বলবেন, এ আর বেশি কথা কি! তাই বলে রাইফেল সহোদর হয় না, রোবট কুম্ভকর্ণও নিকষার পুত্র হয় না।

যাই হোক, যা বলছিলুম। দময়ন্তী কি অশ্বক্ষুরের খটাখট শব্দের সঙ্গে রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দের ভেতরে 'মেঘ গর্জনের ন্যায় গম্ভীর নির্ঘোষ' শুনে ছিলেন? তাহলে তো বলতে হয়, ব্যাসদেবের শব্দ প্রয়োগ ত্রুটিহীন নয়।

এহ বাহ্য। প্রশ্ন উঠতে পারে, সেকালে বিমান না হয় ছিলই। ছিল তো ছিলই, তা নিয়ে এত কথা কেন? এত কথার প্রয়োজন আছে। এইজন্যে আছে যে, যা ছিল তাকেই আবার নতুন করে আবিষ্কার করার কী দরকার? পুরোন আদলটি দেখেই তো আর একটা গড়ে তোলা যায়, কেঁচে গণ্ডুষ করার দরকার হয় না। আধুনিক পণ্ডিতসমাজ প্রাচীন ভারতে এইসব প্রাযুক্তিক কলাকৌশলের কথা ধর্তব্য বলে মনে করেন না। কিন্তু, তা করলে বোধহয় দীর্ঘ গবেষণার প্রয়োজন হয় না, অল্প খেটেই বড় ফল পেতে পারেন। প্রথম প্রচেষ্টায় হয়তো তাজমহল হবে না। তা না হোক, দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় নিঃসন্দেহে গড়ে তুলবেন ইন্দ্রপুরী।

'দেবতাদের' রেখে যাওয়া নজিরগুলোকে একটু নেড়ে-চেড়ে দেখতে দোষ কি? আর্যভট্টের সিদ্ধান্তের ওপর কাজ শুরু করলে নিউটনই হয়তো আইনস্টাইন হতে পারতেন, আরো দু'শ বছর অপেক্ষা করতে হত না। কুতুবমিনার চত্বরে লৌহস্তম্ভের মত ইস্পাত আজো তৈরী করা যায়নি, তার কারণ সে নমুনাটিকে বিশ্লেষণ না করে আকরিক লোহা নিয়েই কাজ শুরু হয়েছে, ফলে এখনো কত বছর পেছিয়ে আছি, কে জানে।

সে কালের প্রাযুক্তির কলাকৌশল সম্পর্কে বেশি কথা বলবার মত বিদ্যে আমার নেই, শুধু কয়েকটি দিব্যাস্ত্রের কথা উল্লেখ করেই এ প্রবন্ধ শেষ করবো।

প্রথমেই নাম করতে হয় 'পাশুপত' অস্ত্রের। অনেক তোয়াজ করে, অনেক পরীক্ষা দিয়ে সে অস্ত্র পেয়েছিলেন পাণ্ডুনন্দন, অর্জুন। সে অস্ত্র সকল অস্ত্রের প্রতিষেধক দিব্য অপ্রতিরোধ্য অস্ত্র। অস্ত্রটি যে কী পরিমাণ ভয়ঙ্কর তা বোঝাবার জন্যে মহাদেব বলছেন—

'আমার এই অস্ত্র কখনো কোন মানুষের উপর প্রয়োগ করিবে না। হীনতেজা বিপক্ষের উপর ইহা নিক্ষেপ করিলে সমস্ত জগৎকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। শত্রুগণের দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হইলে, সেই প্রাণসংকটে তখন আত্মরক্ষার জন্য ইহার প্রয়োগ করিতে পারো। শত্রুগণের অস্ত্রসমূহকে প্রতিরোধ করিতেও সর্বদা ইহার প্রয়োগ করিতে পার।'

এখানে আর একটা কথা বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যে-মহাদেব অর্জুনকে পাশুপত অস্ত্র দান করেছিলেন, সে-মহাদেব বোধহয় আমাদের আধ্যাত্মিক জগতের দেবাদিদেব মহাদেব নন। পাশুপত অস্ত্র কেমন করে লাভ করলেন তা ভাইদের কাছে বলবার সময় অর্জুন বলেছেন, 'আমি ভগবান মহাদেবের সহিত মিলিত হইয়াছি'। যে-ইন্দ্রের ঔরসে অর্জুনের জন্ম, মনে হয়, সেই ইন্দ্রের মতই এই মহাদেবও স্বর্গের (কোন গ্রহের) মানুষ। নিরাকার দৈত্যের পক্ষে 'সাকার' অস্ত্র দান করা যেন কেমন ব্যাপার। আরো একটা কথা। স্বর্গ থেকে যাতায়াত এবং সেখানে থাকা সমেত অর্জুনের সময় লেগেছিল পাঁচ বছর। যাতায়াতের সময়টা বোধহয় খুবই কম লেগেছিল। তাই মনে হয়, স্বর্গ খুব কিছু দূরের দেশ ছিল না, হয়তো প্রাক্ মহাজাগতিক বিপর্যয় কালের মঙ্গল গ্রহই বা আমাদের সেই স্বর্গ। ইন্দ্রের মহাকাশযানের গতি আজকের দিনের রকেটের চেয়ে অনেক গুণ বেশি ছিল, একথা মানতেই হয়, কেননা, সেকালের প্রযুক্তিবিদ্যা আজকের কালের চেয়ে নিশ্চয়ই বহুগুণ উন্নত ছিল। একথা অনুমান করার কারণ, যে সব বিমান, অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য নানা বস্তুর বর্ণনা পাই, সেগুলো এত উন্নত পর্যায়ের যে তাদের নাগাল ধরতে আমাদের হয়তো আরো বিশ-তিরিশ বছর লেগে যাবে। একথা আমার কথা নয়, নাসার **(NASA)** 'মহাকাশ স্টেশন' কার্যক্রমের খোদ কর্তা, য়োসেফ ব্লুমরিশের মতন মহাপণ্ডিতের উক্তি।

বলছিলুম অস্ত্রের কথা, এসে পড়লো 'দেবতাদের' কথা। যাইহোক, তারপর বরুণ দিলেন 'বারুণ পাশ'। অস্ত্রটা যে কেমন, তা আমার পক্ষে আন্দাজ করা শক্ত। সে অস্ত্রের ক্ষমতার কথা বলতে গিয়ে বরুণ বলেছেন, 'তারকাসুরের যুদ্ধে আমি এই পাশ দ্বারা সহস্র সহস্র মহাবল দৈত্যকে বন্ধন করিয়াছিলাম। তুমি এই পাশ গ্রহণ কর, ইহার প্রভাবে তোমার হাত হইতে যমও মুক্তি পাইবে না। তুমি যখন এই অস্ত্র লইয়া যুদ্ধে বিচরণ করিবে তখন পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য হইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই'।

যম দিলেন 'দণ্ড অস্ত্র'। সে অস্ত্র সম্পর্কে যম বলেছেন, 'এই অস্ত্র দ্বারা তুমি

গুরুতর কার্য সাধন করিতে পারিবে।' এটিরও স্বরূপ আমার বোধগম্য হয়নি।— আমাদের দেশে অনেক বড় বড় পণ্ডিত আছেন, তাঁরা যদি দয়া করে মুখ খোলেন, তবেই জানা সম্ভব সে সব অস্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ।

কুবের দিলেন, 'অন্তর্ধান' নামা প্রসিদ্ধ অস্ত্র। তিনি বলেছেন, 'তুমি ইহা দ্বারা দুর্যোধনের সৈন্য দগ্ধ করিতে পারিবে। এই অস্ত্র মানসিক বল, দৈহিক বল ও শরীরের কান্তি উৎপাদন করে (ওজস্তেজোদ্যুতিকরং), বিপক্ষের চৈতন্য লোপ করে (প্রস্বাপন মর তিনুৎ)'—এখানে মনে হয়, ব্যাখ্যায় একটু গলদ আছে। যে অস্ত্র শত্রুসৈন্যের চৈতন্য লোপ করে, সেই একই অস্ত্র প্রয়োগকারীর 'ওজস্তেজোদ্যুতিকরং' কেমন করে হবে?—কুবের আরো বলেছেন, এই অস্ত্র নিক্ষেপ করেই মহাদেব ত্রিপুর ধ্বংস করেছিলেন। কিন্তু ত্রিপুর ধ্বংস হয়েছিল যে অস্ত্রে, সে অস্ত্রের বর্ণনা থেকে মনে হয়েছে, সেটি একটি অতি প্রকাণ্ড হাইড্রোজেন বোমা!

ইন্দ্রের কাছে পেলেন 'বজ্র' এবং অন্যান্য 'বৈদ্যুতিক' অস্ত্র এবং তা প্রয়োগের শিক্ষা।

এত সব দিব্যাস্ত্র সংগ্রহ করে অর্জুন ফিরে এলেন ভায়েদের কাছে। স্বভাবতঃই তার ভায়েরা সে সব অস্ত্রের ক্ষমতা একটু দেখতে চাইলেন, অর্জুনও দেখালেন। কিন্তু একটির প্রয়োগেই 'পর্বতসমূহ বিদীর্ণ হইতে লাগিল, বায়ুর প্রবাহ বন্ধ হইল'। তাই দেখে নারদ তাড়াতাড়ি এসে বললেন, 'হে অর্জুন, এই অস্ত্রগুলি লক্ষ্য ব্যতিরেকে কখনও প্রয়োগ করিতে নাই, আবার লক্ষ্য বর্তমান থাকিলেও নিজে অত্যন্ত সঙ্কটে না পড়িলে উহাদিগকে প্রয়োগ করিবে না। এই দিব্যাস্ত্রগুলি অনুচিতরূপে প্রয়োগ করিলে মহা অনর্থ হইবে। শাস্ত্রানুসারে এই অস্ত্রসমূহ শুধু সুরক্ষিত করিয়া রাখিলেই অস্ত্রগুলি বলবান থাকে ও সুখের কারণ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। এগুলি সুরক্ষিত করিয়া না রাখিলে ইহারা ত্রিলোকের নাশের কারণ হয়'।— আমাদের কালেও শুনি এগুলো হাতে থাকলেই শান্তি বজায় থাকবে।

প্রাচীন ভারতের প্রযুক্তিবিদ্যা যে কত বড় ছিল তা অনুমান করা বড় সহজ কথা নয়। সে বিদ্যার ভাণ্ডারে যে কত রত্ন, কত মণি-মাণিক্য ঠাসা আছে, তার হদিস আমার মত অর্বাচীনের পক্ষে দেওয়া কখনোই সম্ভব নয়। 'স্থাপত্য বেদ', 'সমরাঙ্গন-সূত্রধারা প্রভৃতি গ্রন্থের প্রতি ছত্রে কত প্রাযুক্তিক নির্দেশ রয়েছে উদ্ধারের অপেক্ষায়। আমাদের এই বাংলাদেশেই কত বড় বড় পণ্ডিত রয়েছেন। তাঁরা যদি সে সব নির্দেশ উদ্ধার করে দেন, তাহলে যে কত বড় কল্যাণ হয়, তার পরিমাপ করাও চাট্টিখানি কথা নয়।

মানব-বিবর্তন

পলিনেশিয়ার কয়েকটা দ্বীপে ১১শ শতাব্দীর আগে কোন মনুষ্যবসতি ছিল না। ওখানকার মাটি খুঁড়ে যেসব বাসন-কোশন, অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে, তাদের কেউ ১১শ শতাব্দীর আগের নয়। কেউ! কেউ বলেন, সে পলিনেশীয়রা এসেছিলেন এশিয়া থেকে, কেউ বা বলেন, মালয় অথবা ব্রহ্মদেশ থেকে। আরো অনেকে বলেন, তাঁরা এসেছিলেন দক্ষিণ আমেরিকা থেকে। অর্থাৎ, কোথাও থেকে না কোথাও থেকে তাঁরা এসেছিলেন, ওখানকার মাটি থেকে তাঁরা পয়দা হননি। কেউ বলেন না, তাঁরা ওখানকারই ক্রমবিবর্তনের পরিণতি। কেউ বলেন না, ওখানে ঈশ্বর তাঁদের সৃষ্টি করেছিলেন কোন এক 'ষষ্ঠ দিবসে' 'নিজ অবয়বে'।

পলিনেশীয়দের বেলা যে কথা খাটে, গোটা মানুষ জাতটার বেলায় কি সেই কথা খাটতে পারে না? অর্থাৎ 'খাঁটি মানুষ' হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছিল পৃথিবীর বুকে, প্রায় বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি? এসেছিল আহার-অগ্নি-অস্ত্র-বস্ত্র হাতে নিয়ে, আর মাথায় নিয়ে আমাদেরই মতন সহজ বুদ্ধি আর কর্মক্ষমতা?

সত্যি, কেন মাথা রগড়াই মানব-বিবর্তনের বস্তাপচা তর্ক নিয়ে? কেন চেষ্টা করি না, তর্কের বিষয়টাকে অন্যভাবে চিন্তা করতে? কেন ভাবি না, মানুষের ক্রমবিকাশের মূল ধারণাটার গোড়াতেই গলদ থাকতে পারে?

এমন কি হতে পারে না, হাজার আলো বছরের পথ মাড়িয়ে, হাজারো বছরের পাড়িতে আকাশগঙ্গার ওপার হতে বিশাল এক মহাকাশযান ভিড়েছিল আমাদের এই পৃথিবীর শ্বাপদসঙ্কুল তটে? যারা এসে পৌঁছলো, তারা ঔপনিবেশিকও হতে পারে, অথবা নির্বাসিত গুণ্ডা-বদমায়েসের দলও হতে পারে। কিন্তু এত দীর্ঘকালের পাড়িতে, ছেড়ে আসা ঘরের কথা তারা ভুলে গেছে, স্মৃতিতে জেগে আছে, ভুলে যাওয়া সুরের মিষ্টি আবেশটুকুর মত একটা ছায়া-ছায়া গোধূলি স্বপ্ন। ঘর ছাড়বার দিন যে ঔপনিবেশিকতা, যে গুণ্ডামি-বদমায়েসি ছিল, সে গুণ্ডামি-বদমায়েসি-ঔপনিবেশিকতা, সেদিনকার সেই উন্নাসিকতা, বিশাল কালের ধারায় ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাই যারা এসে পৌঁছলো, তারা শুধু ঘর-কাঙাল বুদ্ধিমান মানুষের একটি ছোট দল।

কিছুকাল হয়তো মহাকাশযানটাই ছিল তাদের মাথা গোঁজবার ঠাঁই। পৃথিবীর প্রথম দিনেই তো ঘর ছাওয়া সম্ভব হয়নি। হয়তো বা তার বাতাবরণের প্রতিকূল

গ্যাসমিশ্রণ, অথবা তার শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য-প্রান্তর বাসা বাঁধার পথে অন্তরায় হয়েছিল। তারপর গ্যাসমিশ্রণ যেদিন সয়ে গেছে, কিছু হিংস্র জন্তু-জানোয়ার ধ্বংস হয়েছে রাইফেল-রিভলবারের গুলিতে, সেদিন তারা শুরু করেছে বাসা বাঁধতে। সঙ্গে আনা গৃহপালিত পশু, নানা প্রয়োজনীয় গাছপালা, শস্যকণা দিয়ে গড়ে তুলেছে চাষ-আবাদ, ফেঁদেছে ঘন বিন্যস্ত কুটিরের সারি দিয়ে ঘেরা ছোটখাটো গ্রাম। উপ্ত হয়েছে সমাজ-সভ্যতার প্রথম বীজ পৃথিবীর মাটিতে।

কিন্তু রাইফেল-পিস্তলের গুলি তো ফুরিয়ে গেছে। পাখ-পাখালি, হরিণ-শুয়োর শিকার না করলে যে প্রায় হরিমটর। তাহলে? গুলি-বারুদ তৈরি করতে যে কারখানার প্রয়োজন। সে বস্তু গড়ে তোলার মত রসদ কোথায়? আর কার্তুজহীন রাইফেল তো সামান্য একটা ডাণ্ডা, তা দিয়ে তো হিংস্র জন্তুকে ঠেকানো যায় না, শিকার করাও অসম্ভব। তার চেয়ে তীর-ধনুকই ভালো। তৈরী করতেও কাঠখড় পোড়াতে হয় না, সেগুলো ব্যবহারও করা যায় নিঃশব্দে, শিকারের পালকে না তাড়িয়েই ঘায়েল করা যায়। তীরগুলোও একবার ব্যবহারেই নষ্ট হয়ে যায় না। ফলাটাও ধাতুর না হয় না-ই হল, পাথরের একটা চোকলাকে ঘষে-মেজে নিলেই তো যথেষ্ট।

আগন্তুকদের প্রাযুক্তিক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যান্ত্রিক সভ্যতা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। তার জন্যে যত কিছু দরকার, তার কণামাত্র জোগাড় করা সেদিন সম্ভব ছিল না। পৃথিবী সেদিন তখনও বন্ধু হয়ে ওঠেনি। তা না হোক, কারিগরী হাত, শিল্পী মন, এঁকেছে ছবি, গড়েছে মূর্তি, তৈরি করেছে সংসারের নানা খুঁটিনাটি সামগ্রী—হাঁড়ি-কুঁড়ি থেকে শুরু করে বোতাম, ছুঁচ পর্যন্ত।

এতক্ষণ তো ক্রমবিবর্তনের কোন লক্ষণ দেখতে পেলুম না। যা দেখতে পেলুম, তা শুধু উটকো, ওস্তাদ মানুষের একটা ছোট্ট দল।

গ্রহ-নক্ষত্র নীহারিকা, মহাবিশ্বের সমস্ত কিছু একই বস্তুর সমাহার। তাদের সৃষ্টির নিয়মও সর্বত্র এক। আন্তর্নাক্ষত্র মহাজগতে যে জীবন গঠিত হয়েছে, তাও সর্বত্র একই বস্তুসত্তা দিয়ে। কি পৃথিবীতে, কি আর কোথাও, সে জীবন বাঁধা একই নিয়মের বাঁধনে। মনন, চিন্তন, মনঃ, বুদ্ধি, সবই মহাজাগতিক সত্তা। নানা শক্তিক্ষেত্রের আজো অজানা নিয়মে তারা ক্রিয়াশীল।

মনের যে রহস্যময় সত্তার বাঁধনে যে আচরণ এবং অনুপ্রাণনা মানবমজ্জায় গ্রথিত,

সেই অনুপ্রাণনাই মানুষের মনে বিশ্বরহস্য উন্মোচনে আগ্রহ জাগায় এবং সেই একই অনুপ্রাণনা বিদ্যমান মহাবিশ্বের সমস্ত বুদ্ধিমান জীবের মস্তিষ্কে। একা পৃথিবীর মানুষই পরম ব্রহ্মের খোঁজে আঁতিপাঁতি করেনি। মহাবিশ্বের সর্বত্র, সমস্ত বুদ্ধিমান জীব সে পরমশক্তির অনুসরণ করেছে, না হলে মানুষের আধ্যাত্মিক চিন্তার তন্ত্রীতে মহাজাগতিক প্রেরণা ক্রমাগত আঘাত করতো না।

আজ আমার কাছে, পৃথিবীর মানুষের কাছে, মহাকাশযাত্রা যদি বাস্তব ঘটনা হয়ে থাকে, ছায়াপথের প্রথম যুগের বাসিন্দাদের কাছে কি তা পুরোনো হয়ে ওঠেনি? আমরা যখন মহাকাশ সমুদ্রে আজ তালকাঠের শালুই ভাসাতে পেরেছি, তখন কাল নিশ্চয় প্রকাণ্ড জাহাজও ভাসাতে পারবো এবং অন্য পৃথিবীর কুলে নঙরও ফেলতে পারবো। আমি যা পারি, অন্য কেউও তো তা পারে। পৃথিবীতে গ্রহান্তরের মানুষ যে এসেছিল বেড়াতে কিম্বা উপনিবেশ স্থাপন করতে, সে কথা একদিন গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিলেও, বিজ্ঞানীমহল তা আজ আর উড়িয়ে দিচ্ছেন না।

পৃথিবীর জৈববিবর্তনগত ক্রমের আলোচনা বিজ্ঞানীরা শুরু করেছেন আদিম জৈব 'সূপ' থেকে ('নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন', পৃষ্ঠা ২৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ)। সেইখান থেকে বিবর্তনের পথ বেয়ে এসেছে পাদপ, মৎস্য, কূর্ম, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী, তারপর মানুষ। সেই সঙ্গে তাঁরা নিখুঁত কতকগুলো ভূতাত্ত্বিক যুগেরও নির্দেশ দিয়েছেন, তবে হেথা-হোথা যে দু-পাঁচটা ফাঁক-ফোকর নেই তা নয়। তার ভেতর প্রধান তিনটে যুগের নাম— পুরাজীবীয়, মধ্যজীবীয় আর আধুনিকজীবীয়। যত গোলমাল এই শেষের যুগটাকে নিয়ে, কিছুতেই ঠিক বয়সটা তার বলা যাচ্ছে না। এই যুগের প্লাইস্টোসিন কালে এসে বিজ্ঞানীরা পুরোপুরি বেসামাল।

গোটা আধুনিকজীবীয় যুগের বয়স, তাঁদের মতে সাত কোটি বছর। সেই সাত কোটি বছরকে ভাগ করে হয়েছে ইয়োসিন, ওলিগোসিন, মায়োসিন আর প্লায়োসিন যুগে। তাদের সামগ্রিক ব্যাপ্তি সাত কোটি থেকে দশ লাখ বছর। আর আধুনিকতম প্লাইস্টোসিন আর হলোসিন যুগের ব্যাপ্তি দশ লাখ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত।

সেনোজোইক যুগেই দানব-সরীসৃপের সিংহাসন দখল করেছে স্তন্যপায়ী জীব। দশ কোটি বছর রাজত্ব করার পর দানব-সরীসৃপের দল স্তন্যপায়ীদের হাতে রাজত্ব তুলে দিয়ে নিজেরা কোথায় যে উধাও হয়ে গেল, সে এক রহস্য। কেউ কেউ বলেন, কোন নিকট অতি-নোভার তীব্র বিকিরণের ফলে তারা উজাড় হয়ে গিয়েছিল। তা হতে

পারে, কিন্তু পোকা-মাকড়-স্তন্যপায়ীরা সে মারাত্মক বিকিরণের হাত থেকে রেহাই পেলো কেমন করে? পোকা-মাকড়দের অনেকে তো সেই পুরাজীবীয় যুগ থেকেই বহাল তবিয়তে ঘর-সংসার করে আসছে।

ও কথা থাক। কথা হচ্ছিল মানুষের ক্রমবিকাশ নিয়ে। সে তত্ত্ব মতে মানুষের পূর্বপুরুষ, নরাকার বানর। তার আবির্ভাব ঘটেছিল শুনি, গত দশ লাখ বছরের ভেতর।

প্লাইস্টোসিন হিমক্রিয়ার আগে দীর্ঘ সাত কোটি বছরের লম্বা 'গ্রীষ্মে' অনেক স্তন্যপায়ীর উৎপত্তি ঘটেছে। অনেক বানরও ছিল তাদের ভেতর। বানরকুলে নাকি লেমুর সবচয়ে 'বৃদ্ধ'।

মানুষের পূর্বপুরুষদের ভেতর অস্ট্রেলোপিথেকাসের বয়স প্রায় দশ লাখ বছর, জাভা-মানব পিথেকানথ্রোপাসের বয়স পাঁচ লাখ বছর, পিকিং-মানুষও প্রায় তিন লাখ বছরের প্রাচীন, আর সবচেয়ে অর্বাচীন প্রায়-মানব নিয়াণ্ডার্টাল, হাইডেলবার্গ, গ্রিমলড়ি ইত্যাদির বয়স শুনি, ৩৫,০০০ থেকে ৭৫,০০০ বছর।

ভারি আশ্চর্য লাগে যে, নরাকার বানরের আবির্ভাব ঘটলো গত দশ লাখ বছরের ভেতর, যখন কিনা প্রায় আদ্ধেক পৃথিবীই হিমক্রিয়ায় জমাট। অথচ বিবর্তনতত্ত্ব মতে তাদের আসা উচিত ছিল, তার আগের দীর্ঘ 'গ্রীষ্মে'। সেই তো ছিল উপযুক্ত সময়। সে সময়ে তো আরো অনেক বানরের উৎপত্তি ঘটেছে।

খাঁটি মানুষ, মানে আধুনিক মানুষকে চল্লিশ হাজার বছরের আগে দেখতে পাওয়া যায় না। কঙ্কাল যা পাওয়া গেছে, তার বয়স আরো কম। আড়াই কোটি বছর আগেকার ড্রায়োপিথেকাস মানুষের আদিপুরুষ কিনা, তা নিয়ে নৃতাত্ত্বিকদের ভেতর মতভেদ আছে। ড্রায়োপিথেকাস বিদেয় নিয়েছে নব্বই লাখ বছর আগে, অর্থাৎ ড্রায়োপিথেকাসের অন্তর্ধান আর অস্ট্রেলোপিথেকাসের আবির্ভাবের মাঝে ফারাক সত্তর আশি লাখ বছরের।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে পাওয়া রামাপিথেকাসের মুখ প্রায় মানুষের মত। কিন্তু অস্ট্রেলোপিথেকাস আর রামাপিথেকাসের মাঝে রয়েছে ফারাক, কম করে ধরলেও, এক কোটি বিশ লাখ বছরের।

ওই সব বানর সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না। মাথার খুলি, চোয়ালের হাড়, আঙুল ইত্যাদি থেকে তার চেহারার আন্দাজ করি। অস্ট্রেলোপিথেকাসকে যতটা মানুষের

মতন মনে করি, ততটা মানুষ সে ছিল না। চেহারার মাপজোপ থেকে মনে হয়, তার মগজের পরিমাণ ছিল আমাদের মগজের তিন ভাগের একভাগ মাত্র। তার মানে, সে মগজ আজকের একটা কুকুরের মগজের চেয়ে বড়ও ছিল না, জটিলও ছিল না।

শুনি, অস্ট্রেলোপিথেকাস ইঁট-পাটকেল ব্যবহার করতো, লাঠিসোঁটাও ব্যবহার করতো শিকার করার জন্যে। আপনিও বললেন, আমিও শুনলুম, কিন্তু তার প্রমাণ কোথায়?

তার দেহাবশেষ যেখানে পাওয়া গেছে, সেখানে আরো অনেক জন্তুর দেহাবশেষ পাওয়া গিয়েছিল। সে সব দেখে নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ওয়শবার্ন বলেছেন, অস্ট্রেলোপিথেকাস শিকার করেনি, সে নিজেই অন্যের শিকার হয়েছিল। আর এল লেহমান তাঁর 'The Long Road to Man' বইয়ে বলেছেন, অস্ট্রেলোপিথেকাস একটা ঋজুদেহী বুদ্ধিমান বানর মাত্র ছিল, মানুষ ছিল না।

একালের সব বানরই তো নিরামিষাশী। এমন কথা মনে করার কারণ তো দেখতে পাই না যে সেই মায়োসিন, প্লায়োসিন এমন কি প্লাইস্টোসিন যুগেও কোথাও বানরদের মাংস খাওয়ার ওব্বেস ছিল। তাদের সমসাময়িক হাতি-ঘোড়া-হরিণরাও মাংস খেতো না। না, বানরের কঙ্কালের কাছে অন্য জন্তুর কঙ্কাল দেখলেই বলতে পারবো না, বানরেরা অন্য জন্তুদের মেরেছিল খাবার জন্যে। আত্মরক্ষার প্রয়োজনেও মারা যেতে পারে, অথবা নিজেরাই তাদের শিকার হয়ে থাকতে পারে। তবু বলতে পারবো না, আদিম বানরকুল মাংসাশী ছিল।

ওসব বানরদের হাড়-কঙ্কাল যা পাওয়া গেছে, তা সবই পুরনো পৃথিবীতে। নতুন পৃথিবীতে, অর্থাৎ আমেরিকার কোথাও তাদের দেখা পাওয়া যায়নি। কিন্তু খাঁটি মানুষের অস্তিত্বের সম্ভাবনা তো দু'পৃথিবীতেই সমান। তাকে পাওয়া গেছে ইউরোপে আর মধ্য প্রাচ্যে। অথচ বিবর্তনবাদ অনুযায়ী তাকে পাওয়ার কথা চীনে আর আফ্রিকায় বেশি করে, কেননা নরবানরের অবশেষ তো সেখানেই সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে। পণ্ডিতেরা বলেন, তারা মানুষ হয়েই দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কথাটা ফেলনা নয়, জ্ঞান-বুদ্ধি-রেস্ত বাড়লেই তো আমরা জন্মভূমি পাড়াগাঁ ছেড়ে শহরে চলে যাই। আমাদের প্রথম পুরুষরাও যে যাবেন, তাতে আর সন্দেহ করবার কী আছে।

তা না হয় হল, কিন্তু গরম দেশ ছেড়ে ঠাণ্ডার রাজত্বে গেল কেন? সেখানে যে প্রাণ বাঁচাতেই প্রাণান্ত। উত্তরের হাড়ভাঙা শীতে দেহকে সইয়ে নেবার আগেই তো দেহান্ত ঘটবার কথা। মানুষের গায়ে তো শিম্পাঞ্জির লোম ছিল না।

বাস্তবিক পক্ষে মানুষের লোম নেই। শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে গায়ে তার প্রাকৃতিক কোন আবরণ নেই। চিরকাল সে কৃত্রিম আচ্ছাদনের ওপরেই নির্ভর করেছে।

জাভা-মানবের আবিষ্কার সূত্রে পাওয়া গিয়েছিল একটা খুলি, বাঁ পায়ের উরুর একটা হাড় আর তিনটে দাঁত। দ্বীপের আর এক প্রান্তে পাওয়া গিয়েছিল চোয়ালের একটা হাড়। সবগুলো যদি তারই স্বজাতির হয়, তবু সেগুলোকে জড়ো করলেই যে খাঁটি মানুষের ছবি ফুটে উঠবে, এমন কথা বলা যায় না। আর, সবগুলোই যে পুরুষের হাড়, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? তাছাড়া, মাটির ওই একই স্তরে খাঁটি মানুষের হাড়ও যে পাওয়া গেছে। তার অর্থ, মানুষও ওই নরবানরের সমসাময়িক অথবা, জাভা-মানব ওরই কাছাকাছি সময়ের একটা বানর, ওই সময়েই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিবর্তনবাদ সে কথা স্বীকার করে না।

বিবর্তনের পথে হাতড়াতে হাতড়াতে নানা সময়ে নানা প্রাপ্তির ওপর পণ্ডিতেরা হুমড়ি খেয়ে পড়েন, ভাবেন, এই বুঝি আসল জিনিসটি পেলেন, কিন্তু একটু পরেই দেখেন, মনিব্যাগ নয়, কুড়িয়ে নিয়েছেন গাড়ির চাকার তলায় চেপটে যাওয়া ব্যাঙটাকে।

মানুষের সঙ্গে বাঁদরের একটা উপরি মিল যে আছে, সে কথা মানতেই হয়। কিন্তু অমন মিল তো আরো জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে আছে, তার মানে কি ধরে নেব যে তারাও আমাদের আদিপুরুষের তুতো ভাই?— শুয়োরের আন্ত্রিক যন্ত্রপাতি প্রায় মানুষেরই আন্ত্রিক যন্ত্রপাতির মতন। ভাল্লুকও দু'পায়ে হাঁটতে পারে, অন্ততঃ বাঁদরের চেয়ে ভালো করেই হাঁটতে পারে, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও মানুষের সঙ্গে তার অনেক মিল। তা হলে?

জীবজগতে মানুষের বৈশিষ্ট্য, তার অ-সাধারণত্ব, তার মগজের কারণে। পণ্ডিতদের কেউ কেউ বলেন, মানুষের বড় মগজ হবার কারণ, সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে, ফলে দুটো হাত পেয়েছে মুক্তি। মুক্ত হাতকে ব্যবহার করতে পেরেছে নানা কাজে, গড়েছে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার, গড়েছে শিল্পসামগ্রী। হাতের বহুল ব্যবহারে মস্তিষ্কেরও ঘটেছে প্রভূত উন্নতি। মস্তিষ্কের স্ফূর্তিতে হাতের কাজ শিল্প হয়ে উঠেছে। একের সাহায্যে অপরের উন্নতি ঘটেছে এমনি করে।

শিম্পাঞ্জিও তো শুনি, গাছের ফোকর থেকে কাঠি দিয়ে পোকা-মাকড় টেনে বের করে খায়। কাঠিটা বড় হয়ে গেলে ভেঙে ছোট করেও নেয়। বিবর্তনের পথে মানুষে

পৌঁছতে এটাকে বলা যেতে পারে তার প্রথম পদক্ষেপ। আদ্দিকালের বুদ্ধিমান বাঁদরও হয়তো ওই রকমই করতো। তাহলে শিম্পাঞ্জি আর এগোলো না কেন? মানুষের পূর্বপুরুষ যাদের বলি, শিম্পাঞ্জি তো তাদের চেয়ে বহু লক্ষ বছরের বড়। বিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে তার তো অনেক ধাপই উঠে যাবার কথা। 'নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন' গ্রন্থে ফন দানিকেনও প্রশ্ন করেছিলেন, স্বাভাবিক বিবর্তনের পথ বেয়ে যেতে যেতে নরাকার বানর শিম্পাঞ্জিরও তো কাপড় পরা উচিত ছিল, কিন্তু পরেনি কেন? এ প্রশ্নের সহজ সরল উত্তর, কোন বানরেরই, মানুষ হয়ে ওঠার মত ক্ষমতা ছিল না। মস্তিষ্কের এই বৃদ্ধি, তার জটিলতা এবং তার কর্মক্ষমতা বিবর্তনের স্বাভাবিক ধারায় কখনোই খাপ খায় না। বিবর্তনের মূল কথা পরিব্যক্তি— প্রাকৃতিক নির্বাচন অথবা অনুকূল পরিব্যক্তির ভেতর দিয়ে বেঁচে থাকা।

পরিব্যক্তির অর্থ, কোন বিশেষ জীবের কোন একটি অথবা অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন। বাস্তবিক পক্ষে, সে একটা আকস্মিক ঘটনা। বর্তমান জীবদের দেখে বলতে পারি, পরিব্যক্তির পরিণতি সাধারণতঃ ভালো হয় না। পরিব্যক্তের যদি বংশবৃদ্ধি করার ক্ষমতা থাকেও, দেখা যায়, উত্তরপুরুষ আগের ধারাতেই সে থেকে যায়, পরিব্যক্তের নতুন বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকারের কণামাত্রও সে পায় না। পরিব্যক্তি অনুকূলই হোক আর প্রতিকূলই হোক, পরিব্যক্তের পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্যের বড় একটা উত্তরপুরুষে বর্তায় না।

পরিব্যক্তির কারণ ওষুধ হতে পারে, কঠিন প্রকারের বিকিরণও হতে পারে। অন্তঃস্বত্ত্বা নারীর চিকিৎসায় ওষুধ অথবা রঞ্জনরশ্মির প্রয়োগের ফলে সন্তান বিকলাঙ্গ হতে পারে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হয়ও। থ্যালিডোমাইড সন্তানের বেলায়ও একথা প্রযোজ্য। আরো একটা কথা মনে রাখা দরকার। যে যুগের কথা হচ্ছে, সে যুগ মানুষের যুগ নয়। মানুষ তখনো আসেনি। সে যুগ ছিল জন্তু-জানোয়ারের। জন্তু-জানোয়াররা বিকলাঙ্গ সন্তানকে সাধারণতঃ মেরে ফেলে, না হয় 'ফেলে' দেয়। উদ্দেশ্য, বাঁচে বাঁচুক, মরে মরুক। প্রকৃতির ইচ্ছে বোধহয়, সুস্থ, স্বাভাবিক হতে পারো তো থাকো, না পারো তো বিদেয় নাও। বাহ্যিক আঘাতের কারণে ছাড়া, বন্যদের ভেতরে বিকলাঙ্গ কখনো দেখা যায় না।

নরাকার বানরেরাও যদি আধুনিক বাঁদরের মত দলবদ্ধভাবে থাকতো, তাহলে বাঁদরেরা যা করে, ধরে নিতে পারি, সেকালে তারাও তা-ই করতো। শিশু বিকলাঙ্গ হলে বা অস্বাভাবিক হলে, পালের গোদা তাকে মেরে না ফেললেও তাকে দলছাড়া

করে ছাড়তো। আর বনে-জঙ্গলেই হোক বা সভ্যসমাজেই হোক, একলা যে একটা শিশু বেঁচে থাকতে পারে না, তা বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। একটু বাড়তি বুদ্ধি, অথবা একটু অস্বাভাবিক, অ-সাধারণ শক্তির বলে যদি সে পালের গোদাও হতে পারে, তবুও তার অস্বাভাবিকতা, তার অ-সাধারণত্ব যে তার বংশধরদের ভেতর সংক্রমিত হবেই, এমন কথা জোর দিয়ে কখনোই বলা যাবে না। এক আধটা ক্ষেত্রে যদি হয়ও, তাহলেও তা ব্যতিক্রমই হবে। প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মের ব্যতিক্রম কখনোই নিয়ম হয়ে দাঁড়ায় না।

পরিব্যক্তি অনুকূলই হোক আর প্রতিকূলই হোক, বংশগতি পালটায় না, জাত-বৈশিষ্ট্য ঘুরে ফিরে একই থেকে যায়। এইটেই প্রাকৃতিক নিয়ম। তবু শুনি, এইভাবেই মানুষ হয়েছে, বানর পূর্ব- পুরুষের ঔরসে।— স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষের ক্ষেত্রে।

কিন্তু কথাটা মানি কেমন করে? গোটা ব্যাপারটাই যে বড় গোলমেলে। নিয়মের ব্যতিক্রমই নিয়ম এবং অনুকূল পরিব্যক্তির কথা মানলেও, একই সঙ্গে মানুষের তিন তিনটে জাতের উন্নতির কথা মানি কেমন করে? পিকিং-মানুষ থেকে মঙ্গোল গোত্রীয়, জাভা-মানুষ থেকে নিগ্রো আর নিয়াণ্ডার্টাল থেকে ককেশীয় গোত্র। পরিব্যক্তি ব্যাপারটাই তো আপতিক। এক সঙ্গে তিন-তিনটে আপতন?! এবং, সব ক'টাই অনুকূল এবং একই ধরনের?!

ওই তিনটে নরবানরের বয়সের ফারাক কিন্তু এক-আধ বছরের নয়। কত বছরের, তা আবার বলি। জাভা-মানুষের বয়স পাঁচ লাখ বছর, পিকিং-মানুষের তিন লাখ আর নিয়াণ্ডার্টালের বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে পঁচাত্তর হাজার বছর। ওরা তিনজনেই নাকি মানুষ হয়েছে পরিব্যক্তির সাহায্যে, তাদের তিনজনেরই বৈশিষ্ট্যগত উন্নতিও হয়েছে একইভাবে এবং সমানভাবে।

ব্যতিক্রমকে নিয়ম বলে ধরে নিলে বলতে হয়, ওই তিনটে জাতের বানরের ভেতর যৌনসম্পর্ক ছিল। কিন্তু তেমন নজির তো কোথাও নেই। চিৎকার করে গলার শির ছিঁড়ে ফেললেও তা প্রমাণ করা যাবে না। মানুষ, তা সে আফ্রিকার অরণ্যের অসভ্য বামনই হোক, অথবা শিক্ষিত সভ্য ইউরোপের মানুষই হোক, নিজেদের ভেতর যৌনসম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। কিন্তু কাছাকাছি জাতের ওই দুটো নরাকার বানরে তা কখনোই সম্ভব হয় না। সম্ভব হয়ওনি কখনো। আর, যাদের কথা হচ্ছে, তাদের সম্পর্কেও একথা সত্যি,— স্থান এবং কাল যদি এক হত, তা হলেও সত্যি। স্থানকালের কথা বলছি এই জন্যে যে স্থান-কালের ফারাক তাঁদের মাঝে এত বিরাট

গ্রহান্তরের মানুষ এসেছিল পৃথিবীতে?

গ্রহান্তরের মানুষ এসেছিল পৃথিবীতে? সারা পৃথিবীর আকাশে আজ এ প্রশ্ন ছড়িয়ে গেছে। এ প্রশ্ন যিনি প্রথম তুলেছেন, সেই সুইস্ প্রত্নবিদ্ ডঃ এরিখ ফন দানিকেনকে স্মরণ না করে এ প্রবন্ধের গোড়াপত্তন করা নেহাতই ধৃষ্টতা হবে। এ ভবে সুধন্য তাপস তিনি। দু'টো পুরাতন পুঁথি পাঠ করে অলস কল্পনার থীসিস লিখে সস্তা বাহবা তিনি চাননি। তাঁর মাতৃভাষা জার্মান এবং ফরাসী (ইংরেজীর জ্ঞানও তাঁর অবহেলার নয়) মারফত পুরাতন পুঁথিপত্রের জ্ঞান যতখানি আহরণ করা সম্ভব, ততখানি জ্ঞানের সম্পূর্ণ অধিকারী তিনি। তাছাড়া, তাঁর 'পাখা-লাগানো' পায়ে পৃথিবীর সর্বত্র উড়ে বেড়াচ্ছেন, ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রত্নস্থানসমূহের আনাচে-কানাচে, নিখুঁত করে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখছেন প্রত্যেকটি প্রত্নবস্তু, আজকের নভশ্চারণার যুগের চোখের আলোয় খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাঁর অপূর্ব অদ্ভুত বেয়াড়া প্রশ্নের সদুত্তর।

কে দেবে তাঁর প্রশ্নের জবাব? কেউ দেবে না। কোন মানুষের ক্ষমতা নেই তাঁর প্রশ্নের জবাব দেবার। কিন্তু কী দরকার তার? জবাব তো লেখা রয়েছে প্রত্নবস্তুর বুকে বুকে, পুঁথিপত্রের পাতায় পাতায়। যে ভাষায় সে জবাব লেখা আছে, সে ভাষায় আমাদের হাতেখড়ি হয়ে গেছে, যেদিন আমরা আকাশে উড়তে শিখেছি। বর্ণ পরিচয়ও হয়ে গেছে সেই দিন, যেদিন আমরা চাঁদের মাটিতে পাদচারণা শুরু করেছি।

কুবেরের পুষ্পক রথ যে আমাদের জেট বিমানের চেয়েও বহুগুণে উন্নত ছিল সে কথা বোঝাবার সাধ্য কৃত্তিবাসের ছিল না। বাল্মীকির 'হংসযুক্তেন' কথার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তাই বলে, সে অক্ষমতা তাঁর অগৌরব নয়। অগৌরব আমাদের ভাগ্যের। আমরা সব ভুলে গিয়েছিলুম। আমাদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, সব ঢাকা পড়ে গিয়েছিল বিস্মৃতির স্থূল আবরণে।

এমন বিস্মৃতি কেমন করে সম্ভব হল? এমন তো নয় যে কুরুক্ষেত্রের পারমাণবিক যুদ্ধে সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল? মরুভূমি হয়ে গিয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্র এবং তার আশেপাশে অবস্থিত সেকালের সভ্যতার সব ক'টি অঞ্চল? (প্রসঙ্গত বলি, পারমাণবিক বিস্ফোরণের তেজস্ক্রিয়তার বিষক্রিয়ার নানা ক্ষতির একটা হল স্মৃতিভ্রংশ)। তার বাইরের ভারত তো প্রায় বর্বর-অধ্যুষিতই ছিল। কুরুক্ষেত্র কি রাজস্থানের মরুভূমির নীচে? আমি জানি না।

যে তাদের একের সঙ্গে অপরের দেখাই হয়নি, যৌনসম্পর্ক তো আরো অনেক দূরের কথা।

বিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে কেউ কেউ অভিযোজনের কথা, প্রয়োজনের খাতিরে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানিয়ে নেবার কথাও বলেছেন। বাঘ-সিংহ কখনো কখনো জোড় বাঁধে, তার কারণ মনে হয়, তারা একই জাতের দুটো ভিন্ন শাখা, পারিবেশিক অভিযোজনের দরুন দূর অতীতে আলাদা হয়ে গেছে।

জোড় বাঁধা, মানিয়ে নেওয়া ইত্যাদি কথা থাক। আর একটা প্রশ্ন রেখে কথা শেষ করি।

নৃতাত্ত্বিক বলেন, মানুষ যেদিন প্রথম চাষ-আবাদ শুরু করেছিল, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত নাকি হাজার আষ্টেক-নয় বছর মাত্র কেটে গেছে। আর, মানুষের লেখা পুঁথি-নথি যা আছে পৃথিবীময় ছড়িয়ে, তাদের বয়স হাজার সাতেক বছর। কিন্তু ওইসব নথিপত্রের কোথাও তো তাদের যাযাবর জীবনের কথা, চাষী জীবনের কথা নেই। কেন নেই? তাতে তো দেখি, শুধু স্বর্গ-দেবতা-দর্শনের কথা। গরু-ঘোড়ার হিসেব, ধান-চালের হিসেব তো নেই। যে হিসেব আছে সে তো সব চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্রের, জ্যোতিষের। গোড়ার হিসেব গেল কোথায়? অঙ্ক শেখার কথা গেল কোথায়? আর, শুধু তো আকাশ দেখার অঙ্ক নয়, স্থাপত্য বিদ্যে তো আছে। চুলোয় যাক স্থাপত্য-জ্যোতিষ ইত্যাদি বড় বড় কথা। তার শৈশবের কথা, যে শৈশবের কথা নৃতাত্ত্বিক বলেন, সেই শৈশবের কোন কথা নেই কেন? তবে কি, তারা একেবারে ভদ্দরলোক হয়ে, পণ্ডিত হয়ে, তবে লিখতে শুরু করেছিল? ছেলেবেলার কথা লিখতে, অ-সভ্য জীবনের কথা লিখতে কি তারা লজ্জা পেয়েছিল? মানুষের স্বভাব তো তা নয়। ছেলেবেলার কথা বড় গলা করেই তো বলে থাকে। তাহলে তারা বলেনি কেন? বোধহয় এর সহজ সরল জবাব, তাদের 'ছেলেবেলা' ছিল না, পৃথিবীতে তাদের ছেলেবেলা কাটেনি। মানুষের যৌবনেরই লীলাভূমি পৃথিবী।

আমার অনুমান কি ঠিক? কী জানি।

কিন্তু এত খুঁজেও তো আমার আদিপুরুষের দেখা এ পৃথিবীতে কোথাও পেলুম না। কত দীর্ঘকাল চষে ফেললুম, নিজেকে টানতে টানতে নিয়ে গেলুম বিবর্তনের ধারায় উজান বেয়ে মহাদেবের জটা পর্যন্ত, তবু কোন নরাকার বানরকে চিনতে পারলুম না, আমার আদি পুরুষ বলে। তাই তো মনে হচ্ছে, পৃথিবীর বিবর্তনের পথে সে-পুরুষ পা বাড়ায়নি কোনকালে। সে সৃষ্টিছাড়া, দলছুট। আকাশগঙ্গার ওপারের কোন ঘাট থেকেই সে একদিন এসেছিল, ঘর বেঁধেছিল পৃথিবীর বুকে। তার বিবর্তনের ধারা নিশ্চয় হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন খানে রয়েছিল।

আমার বয়স কত?

কবে আমি পৃথিবীতে এসেছি? এ-গ্রহে আমার কতকালের বাস? জানি না। কেউ বলে কুড়ি লাখ, কেউ বলে কুড়ি কোটি? জানি না, কোন্ দূর অতীতের কোন্ এক অখ্যাত দিবসে আমারই রক্তের ধারা এসেছিল এ পৃথিবীতে। কবে প্রথম মানুষ হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলুম, তাও জানি না। শুনি, একদিন বাঁদর ছিলুম। তারপর কবে একদিন দাঁড়াতে শিখেছি, শিখেছি পাথরের ছেনি-হাতুড়ি গড়তে, ব্যবহার করতে। কিন্তু সে কবে?

পৃথিবীতে মানুষের প্রথম পদার্পণের দিনটিকে প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক জানতে আঁতিপাঁতি করছেন। মাটি খুঁড়ছেন, বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, মরুভূমির বালি ঘাঁটছেন, ডুব দিচ্ছেন সাগরে। ধরি ধরি করেও ধরতে পারছেন না। আলেয়ার মত সে সরে সরে যাচ্ছে, দূর হতে দূরে।

আফরিকার তানজানিয়া, কেনিয়ায় দেখি, মানুষ ছিল কুড়ি লাখ বছর আগে। প্রমিথিউস মানুষকে আগুন এনে দিয়েছিলেন, সেও পাঁচ-সাত লাখ বছর আগে। ইতালির খনিতে যে নরকঙ্কালটি পাওয়া গিয়েছিল, তারও বয়স অনেক লক্ষ বছর। ওরা তো প্রায় অসভ্য মানুষ, সভ্যতার আলো শুনি, পৌঁছোয়নি ওদের কাছে। কিন্তু, স্যুয়েনিয়ার লোহার খনি থেকে কেউ লোহা বের করেছে যে ৪৩,০০০ বছর আগে। উত্তর মিশিগানের তামার খনি থেকে কেউ তামা তুলেছে, সেও তো আজ নয়, হাজার হাজার বছর আগে। কোন অজানা যুগে কাটা সুড়ঙ্গের সারি রয়েছে উটার সারি উটার ওয়াটিসের কয়লার খনিতে। সে খনির কয়লা এত পুরনো যে আজ তা ব্যবহারের অযোগ্য। অমন সুড়ঙ্গের সারি দেখে বুঝতে পারি, আমার চেয়ে সভ্য, নিদেন আমারই মতন সভ্য কোন মানুষ ও-খনির কয়লা কেটে তুলেছিল। কে সে? কবে কেটেছিল সেই কয়লা?

ফিসার ক্যানিয়নের (নেভাডা) কয়লার স্তরে যেদিন মানুষের পায়ের ছাপ নয়, জুতোর ছাপ পড়েছিল, সে-দিনটির হদিস পেয়েছি। সে-দিনটি ছিল দেড় কোটি বছর আগে। গোবি মরুভূমির বেলে-পাথরের স্তরে আরো একটি জুতোপরা পায়ের ছাপ রয়েছে। যার পায়ের ছাপ, সে উপানহীর বয়সও কম নয়। ফিসার ক্যানিয়নে যিনি গিয়েছিলেন, তাঁরই ভাই-ভাইপো বলেই মনে হয়। উটার বদ্বীপে আর একটা

ওইরকম ছাপ আছে, তার সঙ্গে গাঁথা রয়েছে দু'একটা ট্রাইলোবাইটের কঙ্কাল। তার মানে, সে-ট্রাইলোবাইটরা হয় জুতোর ছাপের ওপর মরেছিল, নয় জুতোর চাপে মারা পড়েছিল। ট্রাইলোবাইটরা ছিল, যাদের বলা হয়, পুরাজীবীয় (Palaeozoic)। জলজ প্রাণী ছিল তারা। কিন্তু সে কবে বলুন তো? ওরা নির্বংশ হয়ে গেছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে অন্ততঃ কুড়ি কোটি বছর আগে। তখন মানুষের পায়ে জুতো? তখন তো শুনি, বাঁদরও ছিল না। বাঁদর থাকলেও কি জুতো পায়ে দিতো? ক্রমবিবর্তনের ক্রমটার শুরু কোথায়, কত দূরে? কোন্ ডারউইনের কাছে এ জিজ্ঞাসার জবাব পাবো?

মানুষের হাতে গড়া জিনিসের কত নজির রয়েছে চোখের সামনে। ক্যালিফর্নিয়ায় পাওয়া একটুকরো স্ফটিকের ভেতরে ছিল একটা লোহার পেরেক। নেভাডার খনির ভেতর একটুকরো ফেল্‌স্পারে গাঁথা ছিল একটা ইস্কুরুপ। ইস্কুরুপটা তো কবেই মরচে ধরে উবে গেছে, রয়ে গেছে তার পেঁচের নিখুঁত ছাপটা। অস্ট্রিয়ার সোয়েণ্ডর্ফ্ গ্রামে একটা কয়লার চাঙড়ের ভেতর থেকে বেরিয়েছিল হুকের মতন একটা জিনিস। তার ধারগুলো নিটোল, গায়ে খাঁজ-কাটা, যেন 'মিলিং মেশিনে কাটা'। জানি না, কী সে বস্তু, কী তার ব্যবহার আর কে-ই বা তার স্রষ্টা। তার সৃষ্টির দিনটিও কত লক্ষ বছর আগে, তারও কোন হদিস পাওয়া যায় না। পেরুর একটা কয়লার খনিতেও একটা লোহার পেরেক পাওয়া গিয়েছিল। আমাদের কালের আগে তো শুনি, লোহার ব্যবহারই জানা ছিল না। তাহলে লোহা অথবা ইস্পাত এলো কোথা থেকে? বাঁদরে কি লোহা ব্যবহার করেছে?

এ সব জুতো-পরা পায়ের ছাপ, ওইসব লোহা বা অন্য ধাতুর বস্তু পাথরে কিম্বা কয়লায় যখন পড়েছিল, তখন ও-পাথর পাথর হয়ে ওঠেনি, কয়লাও কয়লা হয়নি, মাটির অত তলায় তলিয়েও যায়নি। ওরা তখন সমতলেই ছিল, নরম কাদামাটির রূপ ধরে।

কেন্টাকির মাটির বারো ফুট নিচে একটা ম্যাস্টোডন পাওয়া গিয়েছিল। সে সেখানে শুয়েছিল তারও তিন ফুট নিচে ছিল কাটা পাথরে বাঁধানো একটা পথ। কে সে পথ কেটেছিল, তিন-চার কোটি বছর আগে, হয়তো ম্যাস্টোডনের কালে, অথবা তারও আগে? তারা কি এ পৃথিবীর মানুষ, না তার স্রষ্টা, দানিকেনের 'দেবতা'—গ্রহান্তরের মানুষ?

জাম্বিয়ার একটা গুহায় মানুষের মাথার একটা খুলি পাওয়া গিয়েছিল (সে খুলি

আজো আছে, লণ্ডনের হিস্টরী মিউজিয়ামে)। তার একদিকে একটা নিখুঁত চিড়হীন ফুটো আর তার উলটো দিকের হাড় ফেটে চৌচির। এমনটা বন্দুকের গুলিতেই সম্ভব। খুলিটার বয়স, বিবেচনা করুন, চল্লিশ হাজার বছর। চল্লিশ হাজার বছর আগে কেমন বাঁদর বন্দুক গড়েছিল? সে বন্দুক ছুঁড়েছিলই বা কোন্ বাঁদর? ঠিক অমনি আরো একটা খুলি আছে মস্কো যাদুঘরে, তবে সেটা মানুষের নয়। বাইসনের। তারও মাথায় গুলির ফুটো আর সেও নাকি দশ হাজার বছরের প্রাচীন।

প্রাচীন চিকিৎসার নমুনাও রয়েছে। বাঁধানো দাঁত আর খুলির হাড় কেটে জোড়া দেওয়া। সরু তার দিয়ে সেলাই করা সে খুলির হাড়।

আরো বিস্ময়কর, আরো ভয়ঙ্কর নজির আছে। সে নজির পারমাণবিক অস্ত্রের। গোটা পৃথিবীর নানা জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে পারমাণবিক ক্ষত,— ইরাকে, মঙ্গোলিয়ায়, সাইবিরিয়ায়, কলোরেডোয়। ভারতবর্ষে তো বটেই, না হলে থর মরুভূমিটা হল কেমন করে? রামায়ণ খুলে দেখুন রামচন্দ্রের পারমাণবিক অস্ত্র নিক্ষেপের ফলেই ও জায়গা অমন মরুভূমি হয়ে গেছে। আর, হয়তো বা সেই কারণেই মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পাও গেছে ধ্বংস হয়ে। না হলে, ওখানকার কঙ্কালগুলো অমন অসম্ভব রকম তেজস্ক্রিয় কেন?

প্রাযুক্তিক উৎকর্ষের কথা বাদ দিয়ে নন্দনবৃত্তির কথাই ধরুন না। ছবি আঁকা রয়েছে নানা গুহার অন্ধকারে। ফ্রান্সের গুহা মাটির অনেক নিচে। নানা ছবির ভেতর সুট-বুট পরা মানুষের ছবিও রয়েছে। সে ছবি এঁকেছিল নাকি ক্রোমানিয়ন মানুষ। সে তো শুনি, লজ্জা নিবারণ করতেও শেখেনি, মাথা গোঁজবার ঠাঁই করা তো আরো দূরের কথা। ছবি আঁকা? সে তো আরো অনেক দূরের কথা। যার প্রাণ বাঁচাতেই প্রাণান্ত, তার মগজটা কিন্তু ছিল আমার মগজের চেয়েও বড়! সেই ক্রোমানিয়ন ছবি আঁকলো কেমন করে, নানা রং দিয়ে? তাও আবার অন্ধকার গুহার ভেতর? প্রদীপের আলোয় তো ছবি আঁকা, বিশেষ করে রঙিন ছবি আঁকা যায় না। আর, প্রদীপের আলো মানে তো জানোয়ারের খুলিতে চর্বি জ্বালানো আলো। সারা পৃথিবীর কত গুহায় কত ভালো ভালো ছবি রয়েছে, কেমন করে, কী আলোয়— কেমনতরো ধূমহীন আলোয় সে সব ছবি আঁকা হয়েছে? এঁকেছেই বা কে? তাহলে কি সে আমার চেয়ে উন্নত ছিল? না হলে তার মগজটা অমন বড় কেন? তবু বলি কেন, সে ছিল গুহাবাসী, অসভ্য, বর্বর? কেন বলবো না, আমি তো তার সভ্যতার কোন চিহ্ন

দেখতে পাই না। যা নেই, তা ছিল বলবো কেমন করে? তাছাড়া আগেই যে ধরে নিয়েছি, বিবর্তনের বর্তমান ধাপে আমিই শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্ত জীব।

আমি উট-কানা। তেরোতলা বাড়ির পাশে রাস্তার ধুলো-কাদায় আমারই মতন মানুষ দিনের পর দিন দিন-গুজরান করছে। আমি শুধু উট-কানাই নই, হস্তিমূর্খও বটে। নোবেল লরিয়েটের সঙ্গে একই কালে আদিম উপজাতিদের দেখেও কিছু বুঝতে পারি না। পরমাণু বোমার পাশে আদিবাসীদের তীর-ধনুক-বর্শা দেখেও আমার মগজে ঢোকে না যে প্রকাণ্ড সভ্য মানুষের পাশে পাথরের কুড়ুল হাতে অসভ্য মানুষ একই কালে, একই সঙ্গে বাস করতে পারে।

কিন্তু কী বলবো? সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কে আমি? কবে এসেছি আমি? এলেম আমি কোথা থেকে? আমিই কি গ্রহান্তর থেকে এসেছিলুম? নাকি, আমার, তথা মানুষের স্রষ্টা, মানুষের জনক এসেছিলেন ছায়াপথের কোথাও থেকে? তাঁরই পায়ের চিহ্ন রয়েছে কি দেড়কোটি-দু'কোটি বছর আগেকার কয়লার স্তরে? তিনিই কি দেখতে এসেছিলেন, তাঁরই পাঠানো বিবর্তনের বীজ, নীল সমুদ্র-শৈবাল, পৃথিবীতে জীব-বিবর্তনের ধারাকে কত দূর এগিয়ে নিলে গেল? তাই হবে হয়তো, নইলে ওই জুতোপরা পায়ের ছাপ আর কবে হবে?

সেই ধারারই কোন ঘাটে যেদিন দেখতে পেয়েছেন, আমারই আদিপুরুষ সেই আদিম নরবানরটিকে, সেই দিনই হয়ত বপন করেছেন মস্তিষ্ক তার করোটিতে, কৃত্রিম পরিব্যক্তির সাহায্যে বিবর্ধিত করেছেন, ত্বরান্বিত করেছেন আমার বিবর্তনকে। তারপর হয়তো বারে বারে এসেছেন, দেখেছেন তাঁর সৃষ্ট জীবের অগ্রগমন ঠিক পথে চলছে কিনা, কৃত্রিম পরিব্যক্তির ফলে সুফল ফলছে কিনা। যতক্ষণ না তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুফল প্রসব করেছে, ততক্ষণ সে মানবসমাজকে বারে বারে ভেঙেছেন, আবার গড়েছেন। তারপর হয়তো সাফল্য এসেছে, কৃত্রিম পরিব্যক্তির সাহায্যে হয়তো সত্যিই মানুষ তৈরী হয়েছে, তাঁরই অবয়বে। তারপর থেকে হয়তো মানুষেরই কল্যাণে, নয়তো তাঁর আপন প্রয়োজনে পৃথিবীতে মানুষের আঙিনায় তাঁর আসা-যাওয়া হয়ে উঠেছে একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সেই আসা-যাওয়ার ইতিহাস ছড়িয়ে আছে মানুষের শাস্ত্রে-কাব্যে-গাথায়-কিম্বদন্তীতে। সেই ইতিহাসের একটা রয়েছে ইজেকিয়েলের দেওয়া বর্ণনায়।

১৯৭৫ সালের আগস্টে এরিখ ফন দানিকেন ভারতে এসেছিলেন, সেই

ইজেকিয়েলের রেখে যাওয়া ইতিহাসের প্রমাণ খুঁজতে।

'দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ?' গ্রন্থে দানিকেন বলেছিলেন, বাইবেলের ইজেকিয়েল 'খোয়াব' দেখেননি, একটি মহাকাশযানকে নাবতে দেখেছিলেন কবার নদীর তীরে এবং সে যানে তিনি কয়েকবার বেড়িয়েও এসেছেন এখানে-ওখানে-সেখানে। একবার তাঁকে সে বিমানে করে খুব উঁচু পাহাড়ের ওপরে বিশাল একটা মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ইজেকিয়েল বলেছিলেন, বিমানটি নেবেছিল পূর্বতোরণের কাছে এবং সেখান থেকেই তিনি মন্দিরের ভেতরে গিয়েছিলেন। নাসার (NASA) বিখ্যাত মহাকাশযন্ত্রবিৎ, য়োসেফ এফ ব্লুমরিশের মতে, পাহাড়ের ওপরে সম্ভবতঃ ইজেকিয়েলের দিগ্ভ্রম হয়েছিল, তাঁকে নিশ্চয়ই উত্তরতোরণ পথেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল— প্রমাণিত হয়েছে, ব্লুমরিশই ঠিক।

দানিকেন কলকাতাকে মাতিয়ে চলে গেলেন শ্রীনগরের কাছে মার্তণ্ড মন্দিরে। নানা যন্ত্রপাতি নিয়ে কীসব মাপজোপ করলেন সেখানে। কিছু কৌতূহলী পণ্ডিত এবং সাংবাদিক জানতে চাইলে, তিনি বোঝাতে চাইলেন তাঁদের, কী তিনি মাপলেন, আর পেলেনই বা কী, কিন্তু বোঝা দূরের কথা, তাঁরা তাঁকে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিলেন। দানিকেন বলেছেন, শেষকালে 'আমাকে অভিনয় করতে হয়েছে, বলেছি, যা খুঁজতে এসেছিলুম তা পাইনি।'।

তাই বোধহয় ২৭শে আগষ্টের যুগান্তরে খবর বেরিয়েছিল,'...বিফল মনোরথ দানিকেন আজ সকালে এখান থেকে দিল্লী রওনা হয়ে গেছেন'।

সম্প্রতি বিজ্ঞান-সাহিত্য লেখক অস্ট্রীয় পেতের ক্রাসার জার্মান ভাষায় লেখা দানিকেনের একখানি জীবনী, 'দানিকেন ইন্তিম' (অন্তরঙ্গ দানিকেন) আমার হাতে এসেছে, তা থেকে অভিযানের ব্যাপারটা তুলে দিচ্ছি। উদ্দেশ্য, দানিকেন সফল কি বিফল-মনোরথ তা দেখানো নয়। উদ্দেশ্য, ইজেকিয়েলের কথার সত্যতার প্রমাণ জোগানো। ক্রাসা লিখছেন,—

'দানিকেনের ভারত-ভ্রমণ এক সহসাঘটিক ব্যাপার। যখন তিনি গ্রহান্তরের মানুষের পৃথিবীতে আগমনের বাস্তবতা প্রমাণে দৃঢ়চিত্ত এবং সে সম্পর্কে প্রত্নবস্তু আহরণে ব্যস্ত, তখন পশ্চিম জার্মানির এক যাদুঘরের প্রধান, ডঃ কার্ল মায়ার তাঁকে আর এক দিগন্তের হদিস দিলেন। সে হদিস পৃথিবীতে গ্রহান্তরের মানুষের বসবাসের ক্ষেত্র অনুসন্ধানের। তিনি কতকগুলো প্রাচীন মন্দিরের নকশা পাঠালেন এবং

ইজেকিয়েল বর্ণিত পর্বতশিখরস্থিত মন্দিরটিকে কাশ্মীরের বলে চিহ্নিত করলেন।

ছুটে গেলেন দানিকেন স্পুটনিক বেগে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে, সঙ্গী একান্ত সচিব ভিলি দুয়েনেন্‌বের্গের্ আর বাহন হরেক-রকমবা বোঝাই বিশ্ববিচিত্র রেঞ্জ-রোভার। অনেক বাধা, অনেক বিপত্তি অতিক্রম করে পৌঁছলেন মন্দিরে— বেশ কিছু নিরুৎসাহের বাণীও এলো পাথেয় স্বরূপ নানা পক্ষ থেকে। তবু, মন্দিরে পৌঁছেই দুই নিত্যসঙ্গী, এরিখ এবং ভিলি নেমে পড়লেন কাজে, মেটাল ডিটেক্টর, রে ডিটেক্টর, গাইগার কাউন্টার ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে। সে-যন্ত্রপাতির প্রধান কাজ তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান দেওয়া। মন্দিরের বিশাল প্রাঙ্গণের প্রাচীরের নাগাল পৌঁছে ডিটেক্টর চালু করলেন। যন্ত্রের হাতল ধরে মাটির কাছাকাছি সমান্তরাল রেখায় পা টিপে টিপে এগিয়ে চলেছেন ভিলি দুয়েনেন্‌বের্গের আর ডায়ালের কাঁটার ওপর নির্নিমেষ চোখ রেখে চলেছেন এরিখ ফন দানিকেন। সে যন্ত্রের সাহায্যে ২৫,০০০ বছরেরও প্রাচীন কোন রশ্মির সন্ধান পাওয়া নিমেষে সম্ভব।

'প্রাচীরের চারদিকে চারটি তোরণ। ইজেকিয়েলের বর্ণনা অনুযায়ী 'দেবতা'দের প্রবেশ ঘটেছিল 'পূর্বতোরণ' দিয়ে, কিন্তু নাসার (NASA) বিখ্যাত মহাকাশপ্রযুক্তিবিৎ, য়োসেফ এফ ব্লুমরিশ দানিকেনের ব্যাখ্যায় অনুপ্রাণিত হয়ে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে ইজেকিয়েল-বর্ণনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে দানিকেনকে জানিয়েছিলেন, 'দেবতাদের' প্রবেশ পূর্বতোরণ দিয়ে হতে পারে না, তাঁদের প্রবেশ ঘটেছিল নিশ্চয় উত্তর তোরণ দিয়ে। সত্যিই পূর্বতোরণের কাছে ডিটেক্টর একেবারেই মুখ খোলেনি, কিন্তু উত্তরতোরণ বরাবর রে ডিটেক্টর আনতেই এক প্রচণ্ড বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটলো। গাইগার কাউন্টারের কাঁটা মিটার ডায়ালের ওপর যেন পাগলের মত লাফালাফি-দাপাদাপি শুরু করে দিলো এবং এক ভয়ঙ্কর তীব্র শব্দ বেরুতে লাগলো যন্ত্রের ভেতর থেকে, যেন যন্ত্রণায় যে ছটফট করতে করতে কাতরাতে লাগলো। এবার দানিকেনের মুখে শুনুন।—'আমি এক মুহূর্ত চিন্তা করলুম, ভাবলুম, ব্যাপারটা আর একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক। যন্ত্রকে পেছিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার এগিয়ে চললুম সরল রেখা ধরে। সেই একই বিস্ময়কর ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো এবারেও। যন্ত্রের সেই কাতর কড়কড়ানি আর কাঁটার উন্মত্ত ছটফটানি। কোন ভুল নেই। ওই বিশেষ জায়গাটিতে তেজস্ক্রিয়তা এত প্রবল যে আমাদের ক্ষুদ্র যন্ত্র দিয়ে তার পরিমাপ করা সম্ভব হল না। এত প্রবল রশ্মি মাপার পক্ষে আমাদের যন্ত্রের মানটা নেহাৎই ছোট।

তাই মনে হচ্ছিল, ডিটেক্টরের কাঁটা যেন ডায়াল থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে।"

'ফন দানিকেন যন্ত্রের সমস্ত বোতাম টিপে টিপে পরীক্ষা করলেন। না, যন্ত্র ঠিকই আছে, তবু হেডফোনে শুনতে পাচ্ছেন অবিরাম কড়কড় কড়কড় শব্দ। দুই সন্ধানী সুনিপুণ নিষ্ঠায় সেই শব্দের দৈর্ঘ্য এবং বিস্তার মাপলেন। দেখলেন উত্তরতোরণ থেকে দীর্ঘ ৫২ মিটার পথ জুড়ে তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে রয়েছে ঋজু সরলরেখায়। আর সে তেজস্ক্রিয়তার বিস্তার দেড় মিটার। মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢুকে দুই সন্ধানী সন্ধান পেলেন, ঠিক মন্দিরের মধ্যিখানে রয়েছে একটি একশিলা বেদী। তার উচ্চতা প্রায় ২.৮০ মিটার এবং সেটি দেড় মিটার বর্গ। ফন দানিকেন বেদীর চারপাশের তেজস্ক্রিয়তার পরিমাপ করলেন। ডিটেক্টর একই উত্তর ঘোষণা করলো,—বেদীটিও প্রবলভাবে তেজস্ক্রিয়, বিশেষ করে তার নিচের অংশ...সফল দানিকেন, সফল তাঁর ভারত অভিযান।...'

এর পরেও একটু কথা আছে। আটাত্তর সালের নভেম্বরে কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রইস্ আমেদ মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীনগরের ভাবা অ্যাটমিক রীসার্চ্ সেন্টার মার্তণ্ড মন্দিরে ওই তেজস্ক্রিয়তার অনুসন্ধান করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের অনুসন্ধানে সেখানে তেজস্ক্রিয়তার হদিস সামান্যই পাওয়া গিয়েছিল। সে কথা দানিকেনকে জানাতে তিনি যা জানিয়ে ছিলেন, তা 'প্রমাণ' গ্রন্থের ২৮১ পাতা থেকে তুলে দিলুম—

...The information given by Peter Krassa in his book about the radioactivity in Martand is in fact partially wrong and partially also exaggerated.

It is true that we have measured the radioactivity, but the measured values may be the result of quite a number of different effects...

Later, back home I was told by an expert in radiology that there could be a number of causes for the inacurate measuring results. A serious test would have to be made over a long period and at different hours of the day, if possible with two independent measuring units.

For this reason I have not emphasized too much on the measuring results obtained in Kashmir and I have used this information only very carefully.

However, I do appreciate your comment and I am particularly

happy to know that Indian scientists have taken the trouble to investigate the phenomenon....

আমি দেখতে পাচ্ছি, ফন দানিকেনেরই মতন ডিটেক্টর হাতে কত প্রত্নতাত্ত্বিক মাটির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মহাকাশের পথে পেছু হেঁটে চলেছেন, মানুষের সূচনার প্রথম বিন্দুটির সন্ধানে। দিন দিন প্রতিদিন তাঁরা পেছু হেঁটে চলেছেন। প্রথম বিন্দুটি কোথায়, এখনো কত দূরে, কে জানে। জানি না, আরো কত পেছু হাঁটতে হবে। আদি বিন্দুটিকে যে খুঁজে পেতেই হবে, নইলে মানুষের ইতিহাস যে রহস্যোপন্যাস হয়েই থাকে যাবে।

Pathagar.Net

পাতাল কোথায়

পাতালের সংখ্যা শুনি, সাতটা। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে যদি নেবে যেতে থাকি পুরাণের মতে, তাহলে পর পর দেখতে পাবো, অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিতল, মহাতল, সুতল এবং সব শেষে পাতাল। ওই সপ্ত পাতাল নাকি স্বর্গের চেয়েও সুখপ্রদ স্থান। সে সব খানে নাকি ময়দানব তৈরী করেছিলেন, 'নানাবিধ পুরী, মণিরত্ন সুশোভিত বিচিত্র বাসগৃহ'।

যাই হোক, সর্বনিম্ন তলটি পাতাল। ধরে নেবো কি সেইটেই পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল? আপনি বলবেন, 'তা কেমন করে হবে, বাড়ি-ঘর, শহর-বাজার থাকবে কেমন করে? মধ্যিখানটা তো গলা ধাতু দিয়ে ভরা?' কথাটা ওই রকমই জানতুম বটে, কিন্তু জানেন তো বিজ্ঞানীদের কথার বড় ঠিক থাকে না। আজ যা বলেন, কাল তাকে নাকচ করে বসে থাকেন। সম্প্রতি তাঁরা এক নতুন কথা শুনিয়েছেন, বলেছেন, পৃথিবীর কেন্দ্রটি তরল নয়, কঠিন। একথা বলেছেন, যোদো-মোদো-রামা-শ্যামাদের কেউ নয়। লন্ডনের স্বয়ং 'দি ইনস্টিট্যুট অব জিয়লজিক্যাল সায়েন্সেজ' এ কথা শুনিয়েছেন। আচ্ছা, কেন্দ্র যদি তরল না হয়ে কঠিন হয়, তাহলে তা ফাঁপাও তো হতে পারে! মানে, বলতে চাইছি, তরল জায়গায় তো গর্ত করা যায় না, কঠিন হলে সেটা সম্ভব হতে পারবে।

কিছুদিন আগে পৃথিবীর দুটো ছবি দেখলুম। ছবি দুটো তুলেছিল মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ এসা-৭ (ESSA-7), ১৯৬৮ সালের ২৩শে নভেম্বর। (আরো দুটো তুলেছিল এসা-৩। না, মোটে দুটো করে ওরা তোলেনি, তুলেছিল হাজার হাজার ছবি, আমরা দেখেছি মোটে দু'চারটে।) সে ছবিতে দেখেছি, পৃথিবীর উত্তর আর দক্ষিণমেরুতে প্রকাণ্ড দুটো ফুটো, যাদের ব্যাস হয়তো দেড় হাজার মাইল। পৃথিবীটা যেন ফুটো করা একটা প্রকাণ্ড পুঁতি! এত বড় একটা গ্রহ, তাতে অমন ফুটো? হয়তো সম্ভব! ধারাকৃতির (Geode) মধ্যিখানেও গর্ত থাকে। পৃথিবীটা তো ধরাকৃতিরই একটা বিরাট সংস্করণ। যে নিয়মে ধরাকৃতি ফাঁপা হয়েছে, সেই একই নিয়মে পৃথিবীও ফাঁপা হবে। তাছাড়া, প্রকৃতির ব্যাপারটাই বোধ হয় ওই রকম। মার্শাল বি গার্ডনার বলেছেন, সব গ্রহই ফাঁপা, পৃথিবীর ক্ষেত্রে তাহলে ব্যতিক্রম কেন হবে? তাই, সে-ও ফাঁপা। তারপর উত্তর-দক্ষিণে একটা সুড়ঙ্গ কেটেও যাতায়াতের পথ করে নেওয়া

যেতে পারে, আবার প্রকৃতির ইচ্ছাতেও অমন ফুটো হতে পারে। আর হ্যাঁ, সেই মধ্যিখানে একটা 'সূর্যও' আছে! বলছিলুম, প্রকৃতির ব্যাপারটাই বোধহয় ওইরকম। নীহারিকাকে দেখুন, তারও কেন্দ্রে এফোঁড়-ওফোঁড় ফুটো, ডোনাটির ধূমকেতুর ছবি তুলে দেখা গেছে, তারও মাঝখানে ফুটো। সবই ফাঁপা, গাছের কাণ্ড, জীবজন্তুর হাড়, তাও ফাঁপা।

পৃথিবীকে ঘিরে যে ভ্যান্ অ্যালেন বলয়ের তেজস্ক্রিয় বেড়া রয়েছে, তাও উত্তর-দক্ষিণে খোলা। ও বলয়জোড়া দেখলে মনে হবে যেন দু'জোড়া চীনের পাঁচিল কেউ তৈরী করে রেখেছে বহিঃশত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্যে। সত্যিই কি তাই নাকি? মানুষের তৈরী? অবশ্য বিশ্বের তাবৎ গ্রহেরই যদি অমন তেজস্ক্রিয় বেষ্টনী থাকে, তাহলে আর তাকে মানুষের তৈরী বলা যাবে না। তবে একটা ব্যাপার সত্যি ভাববার মত, যে পৃথিবীরও যেমন উত্তর-দক্ষিণ খোলা ভ্যান্ অ্যালেন বলয়েরও তেমনি ঠিক উত্তর-দক্ষিণটাই খোলা। কেন? আরো আশ্চর্যের কথা, উত্তর-দক্ষিণের ওই জায়গা দুটো এমনি চুম্বকিত যে ওখান দিয়ে কোন বিমান-টিমান উড়ে যেতে পারে না!

গ্রহের ভেতরকার 'সূর্যটাও' আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার। গার্ডনার বলেছেন, যাকে আমরা মেরুজ্যোতি বা মেরুপ্রভা বলি, সে ওই কেন্দ্রীয় সূর্যেরই আলোর প্রতিফলন। তিনি বলেছেন, মঙ্গল এবং শুক্রের মেরুপ্রভাবও ওই একই ব্যাপার— কেন্দ্রীয় সূর্যের আলোর প্রতিফলন। শুধু বরফের আবরণে অমন ঔজ্জ্বল্য সম্ভব নয়।

উত্তর মেরু (বোধহয় দক্ষিণ মেরুও) বলে কোন একটি বিন্দুরও অস্তিত্ব নেই, তার জায়গায় আছে প্রকাণ্ড একটা উষ্ণ সাগর। কথাটা শুনতে অদ্ভুত লাগছে? ভাবছেন, যারা মেরু আবিষ্কারে গিয়েছিল, তারা কি সত্যিই কিছু আবিষ্কার করেনি, আমাদের শুধু ধাপ্পা দিয়েছিল?

একটা কথা মনে রাখতে হবে, মেরুবৃত্তে কম্পাসের কাঁটা সম্পূর্ণ বেএক্তার হয়ে পড়ে। ১৮৯৫ সালে ফ্রিত্যফ নান্সেন্ গিয়েছিলেন উত্তর মেরু আবিষ্কারে। সেখানে গিয়ে তিনি 'হারিয়ে গিয়েছিলেন' বলেছেন, কোথায় যে তিনি এতদিন ছিলেন, তা তিনি একেবারেই জানেন না।

১৮৯৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে জাহাজ থেকে নেবে নান্সেন্ ভাবলেন স্লেজ্-গাড়ি করে মেরু-বিন্দুতে পৌঁছবেন। তারপর সেখান থেকে চলে যাবেন স্পিৎস্‌বের্গেন। কিন্তু আঠারোশো পঁচানব্বইয়ের ২৯শে মার্চ থেকে ছিয়ানব্বইয়ের মে পর্যন্ত তিনি

একদম বেপাত্তা। কী হল, কোথায় গেলেন, কোথায় থাকলেন, কেউ জানে না, নান্‌সেন্‌ নিজেও জানেন না। তিনি বলেছেন, বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একসময় মনে হল, আবহাওয়া গরম হয়ে উঠছে। যখন দেখেছেন, উত্তরে হাওয়া বইছে, তখনই গরম বোধ করেছেন। এক সময় মনে হল, সূর্যের উত্তাপ অসহ্য। মেরু প্রদেশে অসহ্য গরম, ব্যাপারটা বুঝুন!

প্রতিধ্বনি মাপতে গিয়ে দেখেছেন, মেরু-সাগরকে যত কম গভীর বলে জানা ছিল, তত কম গভীর তো নয়ই, বরং তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি। দেখেছেন, তলার দিকের জল বেশ গরম। সে জল যে কোথা থেকে আসছে, তা তিনি বুঝতে পারেননি। তাছাড়া গরম দেশের জন্তু-জানোয়ারও দেখতে পেয়েছেন সেখানে।

পঁচানব্বই সালের ২৬শে এপ্রিল তিনি লিখেছেন, 'কাল সকালে বরফের ওপরে একটা জন্তুর পায়ের ছাপ দেখে চমকে গেছি। ছাপটা পশ্চিম ঘেঁষা নৈঋত থেকে পূবে চলে গেছে। পরিষ্কার দেখলুম, শেয়ালের পায়ের ছাপ, আর তখনো বেশ তাজা সে ছাপ। শেয়াল এখানে কী করছে, এলোই বা কেমন করে? ছাপ দেখে মনে হল, না-খেতে-পাওয়ার মতন নয়। অর্থাৎ তার খাবারে কোন অভাব এখানে হচ্ছে না বলেই মনে হল। তাহলে কি কাছাকাছি মাটি আছে? চারদিক চেয়ে দেখলুম, কিন্তু সারাদিন ধরে এমন কুয়াসা যে কিছুই দেখা গেল না। সে যাই হোক, এই ৮৫তম অক্ষবৃত্তে (85th parallel) উষ্ণ রক্তের প্রাণী যে রয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আবার কিছু দূরে দেখি ঠিক ওই রকমই আর একটা শেয়াল-চলা পথ। আমরা সেইখানেই তাঁবু খাটালুম। শেয়ালগুলো যে বিপথে এসে পড়েছে, এমন কথা মনে করবার কোন কারণ নেই। ওরা এখানকারই বাসিন্দা।

২৪শে নভেম্বর লিখেছেন, 'য়োহান্সেস (নান্‌সেনের সহকারী) খেতে এলো ছ'টা নাগাত। দেখে মনে হল, সে যেমন ভীত, তেমনি উত্তেজিত। বললে 'একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখে অবাক লাগছে, কম্পাসের কাঁটা চব্বিশ ডিগ্রী হেলে রয়েছে তার ওপর আবার কাঁটার মুখটা রয়েছে পূবদিকে বেঁকে। এমন আজব কাণ্ড 'আমি কখনো শুনিনি'।

নান্‌সেন্‌ যদি পৃথিবী পৃষ্ঠেই থাকতেন, তাহলে তাঁর কম্পাসের কাঁটা বোধহয় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণ করতো, বরং তার চেয়ে একটু বেশি তো কম নয়। যদি ধরে নিই যে মেরু প্রদেশের প্রবেশ পথ সেইখানে, তাহলে পৃথিবীর ঠিক কানায় অর্থাৎ

ভেতরে নাববার মুখে কম্পাসের কাঁটার একমুখ খাড়া নিচে নেবে যাবে, অর্থাৎ প্রায় লম্বভাবে দাঁড়াবে। তারপর যখন ভেতরে নাবছেন, মানে সমতলে আর হাঁটছেন না, তখন কাঁটার মুখ উঠে যাবে ওপর পানে, উত্তর-চৌম্বক-মেরুর দিকে (অর্থাৎ ঠিক উত্তরে নয়)। সমতলে যখন হেঁটেছেন, তখন কিন্তু কাঁটার মুখ উত্তর দিকেই দেখিয়েছে। নান্‌সেনের ক্ষেত্রে কাঁটার অমন ব্যবহার দেখে মনে হয়, নান্‌সেন্‌ মেরুপথে পৃথিবীর ভেতর দিকেই ঢুকছিলেন।

ডঃ জর্জ টিটম্যানের একটা কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। টিটম্যান ছিলেন ওয়াশিংটনের উপকূল এবং ধরাকৃতি সংক্রান্ত সমীক্ষার প্রধান। তিনি বলেছিলেন, 'মেরুর আশপাশ সম্পর্কে সত্যিই কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নেই। কেউ বলেন, ওখানে একটা সমুদ্র আছে, কেউ বা বলেন, একটা উর্বর দেশ আছে। তবে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা মেরুর আশপাশের থেকে তার কিছু তফাতের অঞ্চলের কিছু একটা পার্থক্য আছেই'। এই সঙ্গে নান্‌সেনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। মনে হয় খোলা সমুদ্র ওখানে আছে। যাঁরাই মেরু অভিযানে গেছেন— নান্‌সেন্‌ সমেত— তাঁরাই দেখেছেন, দিগন্তরেখা উত্তর-দক্ষিণে ছোট হয়ে আসে, কিন্তু পূব-পশ্চিমে তা হয় না। এই থেকেই মনে হয়, ওই উন্মুক্ত উষ্ণ সাগর ধীরে ধীরে পৃথিবীর ভেতর পানে নেবে গেছে।

রুশীদেরও পুরোনো নথিতে দেখা যায়, মেরু কোন একটি বিশেষ বিন্দু নয়, সেটা একটা দেড় হাজার মাইল লম্বা রেখা। বোধহয় তাদের নিরীক্ষায় একটা ভুল আছে। আসলে সেটা রেখা না হয়ে বৃত্তই হবে। গোলকের ওপরে ওই বৃত্তকে ঠিকভাবে স্থাপন করা যায় না বলেই তা দ্বিমাত্রিক রেখায় পরিণত হয়েছে। রুশীদের বক্তব্য, উচ্চতর অক্ষাংশে নাবিকেরা তাদের চৌম্বক কম্পাসের অদ্ভুত ব্যবহারে সব সময়েই মুস্কিলে পড়েছে। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের আপাত অপ্রতিসাম্য এবং তার অস্বাভাবিক ব্যবহার তাদের বিচলিত করেছে। আগের দিনের চৌম্বক-মানচিত্র অনুমাননির্ভর। সেখানে ধরে নেওয়া হয়েছে, উত্তর চৌম্বকমেরু একটি বিন্দু। তাই মেরু অভিযাত্রীরা আশা করতেন, মেরু বিন্দুর যত কাছে যাবেন, কম্পাসের কাঁটার মুখ তত নিচু হবে এবং ঠিক-বিন্দুটিতে পৌঁছুলে সে কাঁটা সোজা নেবে যাবে নিচে বিন্দুর ওপর। কিন্তু দেখা গেছে কাঁটা নিম্নমুখ হয় মেরুসাগরের অনেক দূর পর্যন্ত, প্রায় তাইমির উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিমের একটি বিন্দু থেকে মেরু-দ্বীপপুঞ্জের আর একটি বিন্দু পর্যন্ত। তাছাড়া, আরো অনেক অজানা জায়গা আছে, বুদ্ধির অগম্যও কিছু আছে

ওদিকে, যাদের হদিস হয়তো পাওয়া যাবে গবেষণার পথে, কিছুকাল পরে। পৃথিবীর দুটি মেরুতেই অবস্থা একরকম।

একটা বিমান সংস্থা বলে, তারা নাকি উত্তরমেরুর ওপর দিয়ে যাতায়াত করে। বাজে কথা। ভৌগোলিক মেরুর দেড় হাজার মাইলের ভেতরে তারা ঢোকে না। চৌম্বক মেরুর আড়াইশো মাইলের ভেতরেও নাক ঢোকায় না। আসলে সে এলাকায় তাদের কম্পাস কাজ করে না, তাই তার ধারে কাছে তারা ঘেঁষতে সাহস পায় না। এতৎসত্ত্বেও মনে হয় নান্‌সেন্‌ এবং আরো কেউ কেউ পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে কিছুদূর গিয়েছিলেন। সে অভিযাত্রীদের একজন বোধহয় অ্যাড্‌মিরাল রিচার্ড ই বার্ড।

মেরু প্রদেশের আর একটা বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, সেখানকার ধূলো। অত ধূলো কেন ওখানে? কোথা থেকে আসে অত ধূলো? নান্‌সেন্‌ বলেছেন, 'চল ফিরে যাই। কী জন্যে থাকবো এখানে? ধূলো ছাড়া তো দেখছি আর কিছু এখানে নেই।' মেরুর আকাশের ধূলোর মেঘ জাহাজের ওপরে ধূলো বর্ষায়। বরফের ওপরে পড়ে সাদা বরফকে কালো করে দেয়। কোথায় অত ধূলোর উৎস? কোন 'জ্যান্ত' আগ্নেয়গিরি নেই তো ওখানে? সে ধুলোকে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, দেখা গেছে তাতে আছে লোহা আর কার্বন। আরো মজা, ওখানকার ধূলো বরফে শুধু কলির পোঁচই দেয় না, রঙে রঙে রাঙিয়েও দেয়।—লাল, গোলাপী, সবুজ, নীল, হলুদ রঙে রাঙা হয়ে ওঠে ওখানকার তুষার ক্ষেত্র বিভিন্ন ঋতুতে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তাতে রয়েছে ঔদ্ভিদ বস্তু। ফুলের রেণু পড়েই অমন রঙীন হয়ে ওঠে ওখানকার তুষার। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে রঙও বদলায়। উইলিয়ম রীড্‌ বলেছেন, 'এ রহস্যের সমাধান মিলতে পারে একমাত্র "পাতাল" থেকে। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন রঙের অমন বর্ষণ দেখে মনে হয় বিভিন্ন সময়ে ওইরকম নানা রঙের ফুল ফোটে সেখানে।...' কিন্তু অত রেণু? তার জন্যে যে বহু হাজার বিঘের ফুলের চাষ দরকার! পৃথিবীর ওপরে তো অমন চাষ কোথাও হয় না। তাহলে ধরে নিতেই হয়, পাতালের ওই প্রবেশ পথ বেয়েই আসে ওই রেণুর মেঘ।

আরো একটা প্রশ্ন। দূরতম উত্তরে অত গরম কেন? অমনটা হওয়া সম্ভব, যদি পৃথিবীর ভেতর থেকে, তথা পাতাল থেকে উত্তুরে বাতাস বয়। ক্যাপ্টেন সি এফ হলের কথা উদ্ধৃত করেছেন উইলিয়ম রীড। ক্যাপ্টেন্‌ হল বলেছেন, 'যা ভেবেছিলাম, তা নয়, এ দেশটা বেশ গরম। জায়গাটা প্রচুর প্রাণময়ও বটে, কত যে

প্রাণীর বাস এখানে তার আর গোনাগুনতি নেই— কত রকমের যে পশুপক্ষী আছে, তা বলে শেষ করা যায় না...।' যে পাতালে এত ফুল, এত পশুপক্ষী, এত মিষ্টি আবহাওয়া, সে তো স্বর্গ। কারা বাস করে সেথা? দানিকেনের দেবতারা, সেই যারা যুদ্ধে হেরে গিয়ে পালিয়ে এসেছিল?

এ নিবন্ধের গোড়ায় পৃথিবীর দুটো ছবির কথা বলেছিলুম। বলেছিলুম, ছবির উত্তরে আর দক্ষিণে দুটো প্রকাণ্ড গর্ত আছে। ওই গর্তই আসলে পাতালের প্রবেশ পথ। সম্ভবতঃ ১৯৪৭ সালে অ্যাডমিরাল বার্ড উত্তর মেরুর প্রবেশ পথ ধরে কিছু দূর গিয়েছিলেন পাতালের ভেতরে। তাঁর সব কথা মার্কিন সরকার প্রকাশ করেননি। মৃত্যুর পূর্বে, তিনি বলেছিলেন, 'সে দেশ আছে মেরুর ওপারে।—অপূর্ব সুন্দর, চিররহস্যময় মহাদেশ'।

মার্কিন সরকার অনেক কথাই চেপে রেখেছেন। সে সব কথা চেপে রাখার আর একটি কারণ, অউব (U.F.O.=অজানা উড্ডীন বস্তু)। যত অউবের আনাগোনা দেখা যায়, উত্তর আর দক্ষিণ মেরুতেই। হয়তো পাতাল থেকেই তাদের আসা যাওয়া ওই পথে। না হলে, রুশী-মার্কিন, দুটো সরকারেরই বা এত গোপনতার কারণ কী?

মেরু অভিযাত্রীদের প্রতিবেদনের ছিটকে আসা ছিটেফোঁটায় বুঝতে পারি, পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে দেশ আছে, সে দেশ অসহ্য গরমও নয়, প্রচণ্ড ঠাণ্ডাও নয় আর অপূর্ব সুন্দর দেশ। প্রাণেরও কমতি নেই সেখানে। সীল, মরাল থেকে হাতি (ম্যামথ) পর্যন্ত দেখা গেছে সেদেশে। বাড়ি-ঘর-প্রাসাদ-মন্দির দেখা গেছে কিনা, জানি না। তবে 'সূর্য' যে সেখানে একটা আছে, তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের পৌরাণিক স্তরবিন্যাসেও তো দেখি, একটা পাতালের নাম 'গভস্তিতল'। 'গভস্তি' কথাটার মানে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধানে দেখলুম, 'সূর্য-চন্দ্রের তেজ'। তাহলে, পাতালের সাতটা তলের ঠিক মধ্যিখানের তলটিতে 'সূর্য-চন্দ্রের তেজের' মতন কিছু একটা আছে ধরে নিতে হয়। রহস্যময় সে মহাদেশের আলোক এবং উত্তাপের উৎস হয়তো ওইখানেই। (এ বিষয়ে বিশদ জানাতে পারেন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ঠাকুর মহাশয়।)

যদি ধরে নিই, সে পাতাল জনহীন নয়, কেউ না কেউ থাকে সেখানে, তাহলে যারা থাকে তারাই অউবের মত উচ্চ পর্যায়ের বিমানে চেপে হাওয়া খায়, ভ্যান্ অ্যালেন তেজস্ক্রিয় প্রাচীর গড়ে পৃথিবীকে সুরক্ষিত করেছে তারাই। তারা যে আমাদের চেয়ে অনেক উচ্চ পর্যায়ের জীব, তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

পাতাল দেশটাও বোধহয় আমাদের বাসোপযোগী পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়। 'আমাদের' পৃথিবীর তিন ভাগই তো জলে ভরা। এ গোলকের অভ্যন্তর ভাগে জল-স্থলের অনুপাত ঠিক উল্টো না হলেও, প্রায়-উল্টো দিকেই যাবে। আর সেখানে যদি ময়দানবের বংশধরদেরই বাস হয়, কিম্বা দানিকেনের (বীজ ও মহাবিশ্ব) সেই পালিয়ে আসা দেবতারাই সেখানে সুউন্নত প্রাযুক্তিক সভ্যতার জাল বিছিয়ে থাকে, তাহলে সে যে কত বড়, কতখানি উন্নত সভ্যতা, তাকে ঠাওরাতে আমাদের কল্পনা থৈ পাবে না। ভেবে দেখুন না, যারা ভ্যান্ অ্যালেন্ বলয়ের মত ভীষণ তেজস্ক্রিয় বেড়া দিয়ে পৃথিবীকে ঘিরতে পারে, দুটোমাত্র পথ খোলা রেখে, তারা কেমন ধরনের বৈজ্ঞানিক। তাদের সমকক্ষ কোথায়?

আমাদের এই বিংশ শতাব্দী সম্পর্কে যত ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তার প্রায় সব কটাতেই বলে, ১৯৮০-১৯৮৫ সাল থেকে নাকি নানা দুর্ঘটনা ঘটবে আমাদের পৃথিবীতে, যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে শুরু করে ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয় পর্যন্ত। পারমাণবিক অস্ত্রের বহুল ব্যবহার এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ (সেই সঙ্গে হ্যালির ধূমকেতু) অর্ধেক পৃথিবী ধ্বংস করে ফেলবে। হয়তো তখনি আমাদের যুদ্ধোন্মাদ রাজনীতিকদের গলা টিপে ধরতে উঠে আসবে পাতালের সেই সুউন্নত দেবতারা, তারপর কায়েম করবে সত্যযুগ। ভবিষ্যদ্বক্তাদের মতে ১৯৯৯ সালে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যযুগ। সেদিন মানুষে মানুষে ভেদ থাকবে না, থাকবে না জাতি ভেদ, শ্রেণীভেদ। থাকবে শুধু একটি মাত্র শ্রেণী, একটি মাত্র জাত, সে সবার উপরে সত্য মানুষ জাত। এত ধর্মও সেদিন থাকবে না। একটি মাত্র পরম ধর্ম সমস্ত মানুষকে ধরে থাকবে শান্তির নিবিড়তম বন্ধনে। ক্ষুদ্র মানব-স্বার্থ ভুলে মানুষ সেদিন গ্রহে-গ্রহান্তরে পাড়ি জমাবে বন্ধুত্বের, ভ্রাতৃত্বের বাণী বহন করে।

উল্লেখপঞ্জী—

বীজ ও মহাবিশ্ব—Dr. Erich Von Daniken.

A Journey to the Earth's Interior—Marchall B. Gardner.

Worlds Beyond the Poles—F. A. Giannini.

Farthest North এবং In Northern Mist—Dr. Fridjof Nansen.

The Secret of the Ages—B.L.P. Trench.

The Phantom of the Poles—W. Reed.

চাঁদের ওপিঠ

ঊনপঞ্চাশ সালের ৭ই অক্টোবর। লুনিক— ৩ নিয়ে এলো চাঁদের ওপিঠের ছবি। আহা মরি সুন্দর কিছু নয়। মুখময় বসন্তের দাগ, থ্যাবড়া চাকাপানা। রং ময়লা।

থাকগে ওসব কথা। চাঁদ মেয়েও নয়, তার বয়সও অল্প নয় যে রূপ নিয়ে ব্যাখ্যানা করবো, কাব্যি করবো। তার চেয়ে আসল কথায় আসি।

যে ছবি দেখে এত কথা বললুম, সে ছবিই নাকি সব নয়। রুশী-মার্কিন নভশ্চরদের তোলা আরো অনেক ভালো ভালো ছবি আছে। সে-সব ছবিতে দেখা যায় চাঁদের বুকের ওপর মিনারের মতন এক ধরনের স্তম্ভ। লম্বায় চল্লিশ থেকে সত্তর-পঁচাত্তর ফুট, আর ব্যাস, তাও ধরুন, কম নয়, পঞ্চাশ ফুট তো বটেই। ছবিগুলো তুলেছে, মার্কিন অর্বিটার— ২ আর রুশী লুনার—৯। দু'জনে কিন্তু একই জায়গার ছবি তোলেনি। এ যদি তুলে থাকে টোকিওয়, ও তুলেছে ফ্রাঙ্কফুর্টে। ওগুলো যে কী, তা রুশী-মার্কিন দু'জনের কেউ বলেননি। কেন বলেননি, ওঁরাই জানেন।

কী ও গুলো? ক্রিয়াশীল কোন যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রেরক স্তম্ভ? না কি, প্রাচীন কোন খনিক ব্যবস্থার সাক্ষী?

বছর চল্লিশ আগেই স্তম্ভগুলো জ্যোতির্বিদদের চোখে ধরা পড়েছিল। 'অউব' (UFO) সম্পর্কে পণ্ডিত বি এল ট্রেঞ্চ বলেছেন, 'ষাট সাল পর্যন্ত অমন প্রায় দুশো স্তম্ভ দেখা গেছে, আরো অদ্ভুত কথা, দেখা গেছে, ওরা ঠাঁই বদল করে,— আজ হেথা তো কাল হোথা। মনে হয় যেন, ওগুলো বসিয়েছে কোন বুদ্ধিমান জীব'। আমাদের নভশ্চরেরা কি ওদের দু'চারটেকে দেখেছে? কে জানে? কেউ তো মুখ খোলে না।

চাঁদের যে ধূলো-বালি-পৃথিবীতে আনা হয়েছে, তাতে দেখা যায়, চাঁদের বুকে বেশ খানিকটা টাইটানিয়াম আছে। ও ধাতুটি আমাদের গ্রহে প্রায় বিরল। ওই টাইটানিয়াম আর লোহা-নিকেলের প্রয়োজনেই কি কেউ আমাদের সৌরজগতে এসেছিল শত শত আলোবছর পাড়ি দিয়ে?

অমন উদ্দেশ্যে চাঁদের আকর্ষণ বড় কম নয়। কেননা, উপগ্রহ হিসেবে তার গতর বিপুল। তাই তো পণ্ডিতমহলের ধারণা, চাঁদমামা এককালে গ্রহ ছিল। অবস্থা বিপাকে পৃথিবীর কোটায় আটকা পড়ে গেছে। আইজাক আসিমফ 'ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফ্যান্সি'তে বলেছিলেন, 'আমাদের চাঁদের ভর পৃথিবীর ভরের ১/৮০। সৌরজগতের আর কোন

চাঁদের ভর তার ধারে কাছে যায় না। আর পৃথিবীর মাপের গ্রহের অত বড় চাঁদে কী প্রয়োজন? কাছের গ্রহগুলোর ভেতর মঙ্গলের চাঁদ দুটো তো খেলনা বললেই হয়, আর বুধ-শুক্রের তো ও বালাই একেবারেই নেই'। প্রায় ওইরকম কথাই দানিকেনও শুনিয়েছিলেন, তার 'দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ?' গ্রন্থে। হোয়েরবিগেরের 'থিওরী অব স্যাটেলাইটস'-এর কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন হোয়েরবিগেরের তত্ত্বের মূল দাবি হল, এক সময় একটা গ্রহ পৃথিবীর আওতায় ধরা পড়ে। পৃথিবীর মহাকর্ষ যতই তাকে কাছে টেনে আনতে লাগলো, পৃথিবীর আপন আবর্তনগতি হয়ে আসতে লাগলো ততই শ্লথ। অবশেষে সে গ্রহ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল আর স্থান পূরণ করলো চাঁদ। কথাটা বোধহয় মায়ারাও জানতো। তাদের 'মহান মূর্তির' গায়ে উৎকীর্ণ প্রতীকগুলোও নাকি ওই কথাই বলে।

পৃথিবীতে যারা এসেছিল (যদি সত্যিই এসে থাকে, অর্থাৎ দানিকেনের দাবি যদি সত্যি হয়), পৃথিবীতে নাববার আগে তারা হয়তো চাঁদেই নেবেছিল। এত বড় একটা গ্রহে নাববার আগে অনেক বিচার বিবেচনার প্রয়োজন। পৃথিবীর শতকরা ৭০ ভাগ জলে ঢাকা, তার বাতাবরণও খুব ঘন, তাই দূর থেকে তাকে দেখাও যায় না ভালো করে। চাঁদ তার চেয়ে অনেক ছোট, তাঁর আবহমণ্ডল নেই, আর বলতে গেলে, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি, বন্যা, তেজস্ক্রিয়-বলয় ইত্যাদির উৎপাত থেকে সে প্রায় মুক্ত। যারা এসেছিল তারা হয়তো ওইখানে বসেই পৃথিবীকে দেখেছে, পাঠিয়েছে ছোটখাটো পর্যবেক্ষক দল, পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজনে। কিন্তু মনে হয় ও কাজটা তাদের কাছে গৌণই ছিল। আসল কাজ ছিল চাঁদের বুকে বসে চাঁদেরই দাড়ি ওপড়ানো,—তার বুকে বসে তাকে ধীরে ধীরে ফোঁপরা করে ফেলেছিল তারা। তার অন্তরের ধাতব 'অস্থি' কুরে কুরে বের করে নিয়েছিল তারা নিঃশেষে। আজ নাকি সে খোলা-সার, অন্তঃসারশূন্য। আমাদের নভশ্চরেরা চাঁদে পৌঁছনোর পর আমাদের নভোভূবিৎ এবং নভোপদার্থবিৎ পণ্ডিত সমাজ সবচেয়ে অবাক হয়েছিলেন, চাঁদের ধাতব 'আঁটির' অস্তিত্ব নেই দেখে।

সর্বাধুনিক তত্ত্ব মতে, পৃথিবী আর চাঁদ একই জগতের মহাজাগতিক বস্তুনিচয় দিয়ে গড়া আর তাদের জন্ম-সময়ও কাছাকাছি। চাঁদের পাথরের নমুনা বলেছে, চিরকাল সে অন্তঃসারশূন্য ছিল না, তারও অস্থি ছিল আর সে অস্থি ছিল পৃথিবীরই মত গলিত ধাতুর। তাহলে কী হল তার? কোথায় গেল সে ধাতুর ভাণ্ডার?

ছোট হলেও একটা গ্রহের পেটের ভেতর থেকে গলিত ধাতুর ভাণ্ডার শুষে বের করে নেবার কথা আমাদের আজকের দিনের পণ্ডিতরা ভাবতেও পারেন না। একালের চেষ্টায় তো আমরা আমাদের পৃথিবীর বুকে সামান্য একটু আঁচড় মাত্র কাটতে পেরেছি। বিরাট ব্যয়সাধ্য সাম্প্রতিক 'মোহোল প্রকল্পের' উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর গ্র্যানিট এবং আগ্নেয়শিলার স্তরকে ফুটো করতে হবে তার দুর্বলতম প্রদেশে তথা মহাসাগরের তলায়। পৃথিবীর খোলা সেখানে মাত্র তিন মাইল পুরু, যে-খোলা অন্যত্র পঁচিশ মাইল পুরু. কিন্তু সেটুকুও আমরা ফুটো করতে পারিনি।

গ্রহের ওপরকার হাজার হাজার মাইল পুরু মাটি-পাথর-ম্যাগমার (গলিত প্রস্তর) স্তর পেরিয়ে তার অন্তস্তলের প্রচণ্ড চাপ এড়িয়ে গলিত শ্বেত-তপ্ত ধাতু তুলে আনতে কী ধরনের যন্ত্রকৌশল, কেমনতরো প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রয়োজন! তেমন কাজে সময় কতখানি লাগবে, সে কথা চিন্তা না হয় না-ই করলুম।

চাঁদের বুকে অমন কাজ যারা করেছিল, মনে হয় তারা মোটামুটি নির্ঝঞ্ঝাটেই করেছিল। চাঁদের বাতাবরণ নেই, ঝড়-ঝঞ্ঝা নেই, তার মহাসমুদ্র নেই, নেই মহাদেশীয় সরণ, তুষার যুগের উৎপাত নেই, এমনকি বিদ্রোহ করবার মত আদিবাসীও নেই। সেখানে অমন কাজ করা তো ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়ার মত সোজা।

আরো একটা সুবিধে ছিল। পৃথিবী থেকে খনিজ নিয়ে তাদের আপন গ্রহে যাওয়া—হয়তো সে গ্রহ আমাদের সৌরজগতের বাইরেই কোথাও ছিল—ওখান থেকে মোটামুটি সহজই ছিল। ওখানে যে বাতাবরণের বেড়া নেই, অভিকর্ষও যৎসামান্য, তাই ধাতু বোঝাই মহাকাশযানের নিষ্ক্রমণগতির জন্যে তাকে যৎসামান্য শক্তিই ব্যয় করতে হত।

পৃথিবীর বুক চিরে তারা টাইটানিয়াম তুলে নিয়েছিল তাই চাঁদের দেহের সামান্য টাইটানিয়ামটুকুর ওপর তাদের আগ্রহ ছিল না। কিংবা এমনও হতে পারে, আপন নিরাপত্তার কারণেই হয়তো তার দেহের ওপরে আঁচড় কাটতে ভরসা পায়নি। তাকে অন্তঃসারশূন্য করার মূলে হয়তো আশঙ্কা ছিল, দেহে আঁচড় কাটলে বিস্ফোরণ ঘটবে। হয়তো অমনই বিস্ফোরণ ঘটেছিল 'অনামিকা' গ্রহে, যে বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে, মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মধ্যিখানে গ্রহাণুবলয়ের। ('অনামিকা' বললুম বলে হাসবেন না, ওপাড়ার ওরাও তো বলে 'প্ল্যানেট—এক্স্')।

চাঁদের ধাতব অস্থির পরিমাণ কতখানি বা কতটুকু ছিল, তা আমাদের আজকের

বিজ্ঞানীর জ্ঞানের অতীত, তবে তাঁরা এটুকু জানেন, যে আজ আর সেখানে সে অস্থির ছিটেফোঁটাও পড়ে নেই, যা আছে, তা শুধু তার বুকের ওপরে ছড়ানো-ছিটানো সামান্য টাইটানিয়াম।

শুনতে পাই, ঊনষাট সালে রুশীরা চাঁদের ওপিঠের যে ছবি দেখিয়েছিল, সে ছবি নাকি নেহাতই বাজে ছবি। তবে তার কারণও ছিল। তখন যে আমেরিকার সঙ্গে ওদের ঠাণ্ডা লড়াই চলছে। তারপর দুটো দেশই চাঁদ দেখতে যন্ত্রপাতি আর মানুষ পাঠিয়েছে কতবার, ওপিঠের ছবিও তুলেছে অসংখ্য, কিন্তু আমাকে-আপনাকে একটিও দেখায়নি। আজ মনে হচ্ছে, চাঁদে আর তাদের দু'জনেরই কোন আগ্রহ নেই। আমেরিকা তো তার চান্দ্র-প্রকল্প পুরোপুরি বাতিল করে দিয়েছে। আজ দুটো দেশেরই দিলচস্পি মঙ্গলে আর শুক্রে!

আমাদের নভশ্চরেরা চাঁদের মাটি বেশি মাড়ায়নি। কেন তারা বেশি দূর বেড়ায়নি? চাঁদের বুকে তাদের অভিযান অমন সীমিত ছিল কেন? কেন তারা ওপিঠের কোন জায়গায় গেল না? প্রস্তর স্তম্ভগুলোর কথাই বা অমন চেপে গেল কেন? রেঞ্জার প্রকল্পের রেখে আসা ভূকম্পনিক যন্ত্র কি 'বলেছে', চাঁদের মাটির নিচে সুড়ঙ্গের জাল পাতা আছে? চান্দ্র প্রকল্পের জন্যে হঠাৎ কেন টাকার অভাব ঘটলো? দুটো দেশই বা হঠাৎ কেন মহাকাশ প্রকল্পে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো একসঙ্গে?

চাঁদের মাটির নিচে কি গ্রহান্তরের সে মানুষরা আজো ঘাঁটি গেড়ে রেখেছে? মাটির নিচে তাপের হেরফের, মাটির ওপরকার মতন নয়। উল্কাকণার অবিরাম বৃষ্টিও নেই সেখানে আর কিছু অক্সিজেন আর জলীয় বাষ্প হয়তো আজো আছে সে মাটির নিচে। উল্কার আঘাত চাঁদের এপিঠের চেয়ে ওপিঠে কম কেন? গ্রহান্তরের মানুষের কোন শক্তি-ক্ষেত্র কি আজো সেখানে ক্রিয়াশীল? তাদের যন্ত্রপাতি এবং তারা নিজেরা রয়েছে কি সে শক্তিক্ষেত্রের ছত্রছায়ায়?

কার্ল সেগানের মুখে শুনি, চাঁদের প্রায় দশ ভাগ দেখা হয়নি, পরে সেসব জায়গা আবিষ্কৃত হলে তাদের নামকরণ করা হবে। কিন্তু রুশিয়া, আমেরিকা সব দেখলো, দেখলো না কেবল তার দশ শতাংশ মাত্র ভূমি। শুধু তাই নয়, ছবি পর্যন্ত তুললো না। কেন? চাঁদের বিষয় যা জানবার আমাদের বিজ্ঞানীরা কি তার সবটুকু জেনে ফেলেছেন— নাকি আরো বেশি জেনেছেন!

সে সর্বনাশা যুদ্ধের পর যারা বেঁচেছিল তারা তো সব সশরীরে স্বর্গে গেল। সে কি গ্রহান্তরে? আরো যারা বেঁচেছিল, তারা আমাদেরই প্রপিতামহের দল। যুদ্ধের আঁচ তাদের গায়ে লাগেনি। বনে-জঙ্গলে কে কবে বোমা ফেলেছে? তারপর কেটে গেছে হাজার হাজার বছর। প্রকৃতি বসে থাকেননি, বিবর্তন আমাদের এগিয়ে নিয়ে এসেছে আবার আজকের এই উন্নত পর্যায়ে। অনন্ত স্মৃতির কোষাগারের কোটি কোটি কক্ষের কপাট খুলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। সব মনে পড়ছে একে একে। বলবিদ্যা থেকে শুরু করে অপেক্ষবাদ পর্যন্ত অনেক কিছু আজ টেনে বের করেছি স্মৃতির সেই সুগোপন কোষাগার থেকে।

দানিকেনের 'দেবতা কি গ্রহান্তরের মানুষ?' আর 'নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন' পড়ে কোন কিছুকেই আর 'গাঁজা' বলে, অলীক কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে ভরসা পাই না। প্রায়ান্ধকার অতীতের কোন জ্ঞানকেই আজ আর জাদু বলে, আদিম কুসংস্কার বলে হেয় করতে পারি না, যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভারতের সব জ্ঞান, ভারতীয় সব ঐতিহ্যকে নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছি এতাবৎকাল, সেই পাশ্চাত্যেরই এক তরুণ পণ্ডিত শেখালেন, 'কোন কিছুকে নস্যাৎ কর না, ভেবে দেখ, খুঁজে দেখ, পেলেও পাইতে পার পরশরতন'।

বিবেকানন্দ বেঁচেছিলেন মাত্র সাড়ে উনচল্লিশ বছর। তারই ভেতরে সারা পৃথিবীর সমস্ত কর্ম, সমস্ত দর্শনে যে-ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন, তা বোধহয় পৃথিবীর কোন শিক্ষিত মানুষেরই অজানা নয়। কখন অত জ্ঞান আহরণ করবার সময় পেলেন তিনি? রামকৃষ্ণদেবই বা অতবড় দার্শনিক হলেন কী উপায়ে? বিবেকানন্দ তো তবু নামকরা ছাত্র ছিলেন, বি এ পাসও করেছিলেন। পরমহংসদেবের তো শুনেছি, বর্ণপরিচয়ও ছিল না, তা হলে? হেসে উড়িয়ে দেবেন না, আমাদের এক হঠযোগী বলেছিলেন, এক রকম যোগ-ব্যায়াম করলে নাকি 'কুলকুণ্ডলিনী' জাগ্রতা হন। অর্থাৎ, মেরুদণ্ডের নিম্নপ্রান্তে 'কিছু একটা' থাকে, বিশেষ সেই যোগ-ব্যায়ামটি করলে সেই 'কিছুটা' মেরুদণ্ড বেয়ে মগজে প্রবেশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী হয়ে ওঠে ব্যায়ামকারী। তবে কি পরমহংসদেব এবং স্বামীজী ওই ব্যায়াম করেই 'কুলকুণ্ডলিনী' জাগিয়েছিলেন?

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা বলছিলুম। সে সর্বনাশা যুদ্ধের পর কিছু মানুষ নিশ্চয়ই বেঁচে ছিল। বৃদ্ধ, শিশু, নারী তো বটেই। কোথায় ছিল তারা পারমাণবিক বিস্ফোরণের

মুহূর্তে? গুহার গভীরে কি? ভারতের কোথাও 'অ্যাটমিক বাংকার' নেই, কিন্তু গুহা আছে অগুণতি। সে সব গুহার বেশির ভাগই মানুষের হাতে তৈরি। দানিকেন তাঁর 'বীজ ও মহাবিশ্ব' গ্রন্থে এক জায়গায় বলেছেন, 'মালাবার উপকূলের কানহেরিতে অবস্থিত গুহাশ্রেণী মানুষের হাতে কাটা। প্রকৃতির দান নয় সে গুহাশ্রেণী'। সে সব গুহা নাকি জৈনদের। এই 'জৈন' শব্দটাকে 'বিজেতা' অর্থে ধরলে অনেক কথা পরিষ্কার হয়ে যায়। 'দেব সন্তান' পাণ্ডবরা (দেব সন্তানদের জনকরা যে স্বর্গের অধিবাসী ছিলেন, সে কথা মহাভারতেই পড়েছি।) মানব-সন্তান কৌরবদের যুদ্ধে পরাজিত করেছিল। তারপর, আগে কাটা গুহাশ্রেণীতে আশ্রয় নিয়েছিল, মিলিত হয়েছিল পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে। তারা নিশ্চয়ই জানতো গুহার গভীরে পারমাণবিক বিস্ফোরণজনিত তেজস্ক্রিয়তা পৌঁছোয় না। পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার জানলে তেজস্ক্রিয়তা থেকে বাঁচবার উপায়ও যে জানতেই হবে। গুহাবাসের কালে চিত্তবিনোদনের প্রয়োজনেই হয়তো গুহাপ্রাচীর অলঙ্কৃত করেছিল তারা, ছবি এঁকেছিল তাদের অপটু হাতে, কিছু বা পটু হাতও ছিল হয়তো।

বিশাল বিশাল গুহাশ্রেণী যারা কেটেছিল, পাহাড় কেটে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির কি তারাই গড়েছিল? মন্দিরে মন্দিরে গর্ভগৃহই বা কোন্ কম্মে তৈরী করেছিল? দেবমূর্তি স্থাপনের জন্যেই গর্ভগৃহের সৃষ্টি, একথা মানতে যেন মন চায় না। গর্ভগৃহগুলো গোপন গ্রন্থাগার ছিল না তো? কিংবা রত্নাগার? দু'টো সম্ভাবনার কোনটাকেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

গ্র্যানিট কেটে তৈরী ওই গুহাশ্রেণী জৈন-বিহারের প্রয়োজনে যে তৈরী হয়নি তা একটু ভাবলেই বোঝা যায়। জৈনধর্মের জন্মের অনেক অনেক আগেই ওই সুড়ঙ্গশ্রেণী তৈরী হয়নি কি? অজন্তার চিত্রকলার বয়স হয়তো হাজার দু'য়েক বছর, কিন্তু অজন্তা গুহার বয়স? সে কি ওই অপূর্ব চিত্রশিল্পের সমসাময়িক?

কিছুদিন আগে এক পত্রিকায় পড়লুম, মধ্যপ্রদেশের ভূপালের কাছে বিশাল এক সুড়ঙ্গশ্রেণী আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানেও রয়েছে অদ্ভুত সুন্দর চিত্রশিল্প। শুনতে পাই, বেশির ভাগ গুহাচিত্র নাকি 'ক্রোমানিয়ন' মানুষের আঁকা। তারা তো জানি, নিজের দেহই ভালো করে ঢাকতে শেখেনি, সভ্যতার বর্ণপরিচয়ও তো তাদের হয়নি। আঁকি-বুকি নয়, সুসমঞ্জস চিত্রশিল্প যে সভ্যতার বেশ উচ্চ পর্যায়ের দান। সে কথা থাক। গুহাগুলোর ভেতর কি আলো জ্বালানো হত? ক্রোমানিয়ন মানুষ তো বীজ নিংড়ে তেল বের করতে শেখেনি। তারা হয়তো চর্বি জ্বালিয়েছে আলোর প্রয়োজন মেটাতে।

সরকারী ভাবে বলা হয়েছে চাঁদ মৃত। কিন্তু হলে হবে কি, শুনতে পাই আজো তার বুক থেকে সঙ্কেত আসছে। খবর পাচ্ছি, তার খানা-খোঁদলের ওপর দেখতে পাওয়া বিচিত্র এক আলোক উচ্ছ্বাসের। ইউরেনসের আবিষ্কর্তা স্যার উইলিয়াম হার্শেল প্রথম চান্দ্র-সঙ্কেত দ্রষ্টাদের একজন। ১৭৮৩ সালে তিনি চাঁদের অন্ধকার পৃষ্ঠে একটি আলোকিত স্থান দেখেছিলেন। 'তাহার রূপ একটি লোহিত তারকার রূপের ন্যায় এবং তাহার ঔজ্জ্বল্য চতুর্থ মানের তারকার ঔজ্জ্বল্যের ন্যায়'। পরের মাসে তিনি আবার ওই আলো দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু বলেছিলেন, সে বস্তু চাঁদের আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। সাম্প্রতিক চান্দ্র অভিযানের পর জানা গেছে চাঁদে আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব সম্ভব নয় কেননা, অগ্ন্যুৎপাত ঘটাতে গেলে যে-গলিত ধাতু এবং প্রচণ্ড অন্তর্তাপের প্রয়োজন চাঁদে তার অস্তিত্ব নেই। যাইহোক, একষট্টি সালে কিন্তু আরো আলোক সঙ্কেত দেখা গেছে, দেখেছেন এডওয়ার্ড বার এবং জেমস গ্রীনেকার আরিজোনার লাওয়েল মানমন্দির থেকে। অন্য জায়গার অন্যান্য দ্রষ্টারাও সমর্থন করেছেন তাঁদের দেখাকে। এ ধরনের খবর কিন্তু প্রায়ই মেলে। কী সে বস্তু কে জানে। বি এল ট্রেঞ্চ বলেছেন, 'ও আলো শুধু আমাদের জ্যোতির্বিদেরাই দেখেননি, আমাদের নভশ্চরেরাও দেখেছেন, চাঁদের ওপরে অথবা তার কাছে ওইরকম আলোকের উচ্ছ্বাস'।

শনিবার ১৬ই নভেম্বর। আমাদের তিন নভশ্চর পীট কনর্‌্যাড, ডিক গর্ডন এবং অ্যালান বীন হিউস্টনের মিশন কন্ট্রোলকে জানিয়েছেন, ১,৩২০০০ মাইল দূরে তারা দুটি অজ্ঞাত বিমান দেখেছেন।...ওই দুটি বিমানকে দেখা গেছে আলোর মত ইউরোপের সমস্ত মানমন্দির থেকে শুক্রবার সন্ধ্যায়, আমাদের ওই নভশ্চরদের মহাকাশযান অ্যাপোলো ১২-এর কক্ষপথে। জার্মানীর পিনেমুন্টে ঘাঁটির অধ্যক্ষ ডঃ ভাণ্টার রিডেলের ধারণা ওই অউবের যাত্রীরা সম্ভবতঃ পৃথিবীকে পর্যবেক্ষশ করার অভিপ্রায়ে চাঁদকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে। শেষকালে টেঞ্চ বলেছেন, 'আজ না জানলেও জানতে আমরা ঠিকই পারবো, আজ না হোক কাল। তবে একটা কথা আমরা নিশ্চিত জানি, সত্যি কথাটাকে আমাদের কাছে গোপন করা হয়েছে।'

একটা কথা ভাববার মত। ক্রিসিয়ান অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল অবজার্ভেটরির জ্যোতির্বিদ এন এ কোজিরফ চাঁদের আলফনসাস জ্বালা-মুখে একটি লাল আলোর সঙ্কেত দেখেছিলেন আটান্ন সালে। তার ঠিক এক বছর পরেই রুশীরা চাঁদের ওপিঠের ছবি

তুলতে পাঠিয়েছিল। ব্যাপারটা কি কাকতালীয়? কিন্তু অমনতরো কাকতালীয়ের সংখ্যা যে বেড়েই চলেছে।

বুঝতে অসুবিধে হয় না যে সঙ্কেতগুলো একধরনের ভাষা। আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা তার পাঠোদ্ধার করতে পেরেছেন? কিন্তু ও সঙ্কেত কার উদ্দেশ্যে পাঠানো হচ্ছে? কে এমন আছে আমাদের পৃথিবীতে? আমাদের পৃথিবী থেকে পাঠানো তার জবাব তো কোন মানমন্দিরে ধরা পড়ছে না। তেমন সূক্ষ্ম যন্ত্র কি আমাদের নেই? নাকি, ব্যাপারটা জানি, বলবো না গোছের?*

---

* আপল্যাণ্ড ভ্রাতৃদ্বয়ের রচনা অবলম্বনে।

BanglaBoi.Net

অপরা-ব্রহ্মাণ্ড

কোন রসায়নবিৎকে যদি শুধোই, 'আজ্ঞে, রসায়ন কী বস্তু?' তাহলে ভদ্রলোক নিশ্চয় একটু ফাঁপরে পড়ে যাবেন। আমার মতন গোলা লোকের উপযুক্ত, বোধগম্য, দ্ব্যর্থহীন একটা সংজ্ঞা হঠাৎ যোগানো, বড় সহজ কথা নয়। হাতের সাহায্য না নিয়ে ঘোরানো-সিঁড়ি কেমন দেখতে, বোঝানো যেমন কঠিন, এও প্রায় তেমনি কঠিন। ভালো করে বোঝাতে গেলে পরিষ্কার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

সম্ভবতঃ আমার কথা ভেবেই অধ্যাপক ফ্রীদ্‌রিখ রূঙ্গে রসায়নবিদ্যার সহজবোধ্য একটি সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে। না জানি কত চিন্তার পর তিনি তাঁর গ্রন্থের প্রথম বাক্যটি রচনা করেছিলেন— লিখেছিলেন,

'আমাদের পৃথিবীর উপাদানের বিজ্ঞানের নাম রসায়ন। স্থির হোক, গতিশীল হোক, আমাদের চতুষ্পার্শ্বের সমগ্রবস্তু রাসায়নিক গবেষণার অন্তর্ভুক্ত। জল-হাওয়া, ধাতু-খনিজ, প্রাণী-পাদপ,— সব রসায়নশাস্ত্রের অন্তর্গত।'

সংজ্ঞাটি নিঃসন্দেহে প্রাঞ্জল এবং সুখবোধ্য।

রূঙ্গের কাল তো কবেই গেছে কেটে, তাঁর কাল থেকে আজ পর্যন্ত রসায়নশাস্ত্রের কত ওলটপালট হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর দেওয়া সংজ্ঞা—আমাদের পৃথিবীর উপাদানের বিজ্ঞান—আজো সিদ্ধ, আজো অব্যর্থ।

আমাদের পৃথিবীটা নাকি বিরেনব্বইটা মৌল পদার্থের সমন্বয়ে গড়া। পরমাণু-পদার্থবিৎ বলেন, বিরেনব্বই নয়, আরো আছে। পদার্থের তালিকায় তাঁরা আরো কিছু কৃত্রিম মৌল যোগ করেছেন। আমাদের জীবনে তাদের প্রয়োজন নেই বলেই তো মনে হয়। তবে ধরুন ৯৪ নম্বর মৌল, প্লুটোনিয়াম দিয়ে যদি একটা বোমা বানিয়ে ফাটানো হয়! তাহলে? তাহলে যা বলেছি তাই, প্রয়োজনের প্রশ্নটাই বাতিল,— জীবনটাই যে উবে যাবে কর্পূরের মতন।

ওইসব যৌগের অস্তিত্ব প্রকৃতিতে আগে ছিল না। বস্তুর যে ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণা দিয়ে রসায়নবিৎ অন্য বস্তু গড়তেন, তার নাম পরমাণু। ওই অবিভাজ্য পরমাণু নিয়ে তারা বেশ তৃপ্তই ছিলেন, কিন্তু হায় কপাল, আর পরমাণু পরম অনু রইলো না, তাকেও আজ ভাঙা যায়, সেও বিভাজ্য। আজ পাঠশালের ছেলেটাও জানে, পরমাণুর বিভাজনেই বিকশিত হয় পারমাণবিক পরম শক্তি।

মাত্র বিরেনব্বইটা মৌল কেন? তাও তো সব কটা এক সঙ্গে পাওয়া যায়নি। এককালে বিজ্ঞানীর ধারণা ছিল, মৌল মাত্র পাঁচটি— ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। কিন্তু সোনা, রূপো, তাঁবা, লোহা, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, গন্ধক এরা? ফরাসী রসায়নবিৎ লাভোয়াসিয়ে জানতেন কুড়িটা মৌলের পরিচয়। অষ্টাদশ শতাব্দী নাগাত জানা গিয়েছিল বত্রিশটা, তারো কুড়ি বছর পরে ছেচল্লিশটা। ১৮৭০ সাল নাগাত রসায়নশাস্ত্রী ভেবেছিলেন চৌষট্টিটার কথা। ১৯১৪ সালে বোঝা গেল, মৌলের সংখ্যা নিশ্চয় বিরেনব্বই, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ায়, ১৯৩৯ সালে মনে হল, মোটে বিরেনব্বইটা নয়, সম্ভবতঃ আরো আছে, তবে সেই 'আরো'দের অস্তিত্ব হয়তো স্বাভাবিক অবস্থায় নেই।

স্বাভাবিক অবস্থায় না-থাকার যুক্তিটা সোজা। অনেকগুলো মৌলের কথা যখন জানা গেল, তখন ভিয়েনার অধ্যাপক ভল্ফ্গাং দ্যোবেরাইনের এবং কবি ভলফগাং ফন গ্যোতে চাইলেন মৌলগুলোকে একটা বড় রকম সূত্রে বিন্যস্ত করতে, কিন্তু ব্যাপারটা সুবিধের হল না। প্রায় একই সঙ্গে, ১৮৭০ সাল নাগাত রুশী পণ্ডিত মেন্দেলিয়েফ এবং জার্মান পণ্ডিত লোথার মেয়ার বেশ একটা সুষ্ঠু সুন্দর বিন্যাস খাড়া করলেন, যার সুপ্রতিষ্ঠিত, সুবিখ্যাত নাম 'পর্যাবৃত্তিক বিন্যাস' (periodic system) । সাম্প্রতিক কালে আরো অনেক বিন্যাস খাড়া করা হয়েছে বটে, কিন্তু অমনটি আর হয়নি।

চোদ্দ সাল নাগাদ দেখা গেল মেন্দেলিয়েফ-মেয়ারের বিন্যাস পুরোপুরি অভ্রান্ত নয়। যদি এখানে ওখানে দু'পাঁচটা ফাঁক রেখে দেওয়া যায়, তাহলে অবশ্য তাকে অভ্রান্ত বলা যাবে। লোথার মেয়ার বুঝেছিলেন, সে ফাঁকের অর্থ, কিছু মৌল এখনো অজানা, এখনো অনাবিষ্কৃত। অজানা মৌলের আবিষ্কার পর্যাবৃত্তিক বিন্যাস তাই ভালো পথ প্রদর্শকের কাজ করেছে। শুধু বিচার করার ছিল, পরবর্তী মৌলটির গুণাগুণ কি কি এবং কোন্ কোন্ খনিজের সঙ্গে তার থাকা সম্ভব। তারপর খুঁজে না পাওয়া মৌলটি কেমন হবে এবং কোথায় তাকে পাওয়া যাবে, তা অনুমান করা সহজ ব্যাপার। কাজ হয়েছে এ পন্থায়, অর্থাৎ পন্থাটি নির্ভুল। ধীরে ধীরে ইউরেনিয়াম পর্যন্ত পুরো বিরেনব্বইটা মৌলকেই পাওয়া গেছে। ৪৩নং মৌলটি যাকে বলি, টেক্নিশিয়াম, তার অস্তিত্ব দেখানো হয়েছে পৃথিবীর বাইরে, সত্যিই তাকে পৃথিবীতে পাওয়া যায়নি। একবার মনে হয়েছিল, বুঝি বা পাওয়া গেল, নামও দেওয়া হল, 'মাসুরিয়ম', তারপর দেখা গেল ভুল। শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল যুক্তরাষ্ট্রে রূপোলি সাদা গুঁড়োর আকারে, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদকের পরীক্ষা করতে গিয়ে। আর একটি মৌল, নাম আস্টেটিনিয়াম, তাকেও পৃথিবীতে পাওয়া গেছে পারমাণবিক-রসায়নের ক্ষেত্রে। তার সম্পর্ক আয়োডিন, ব্রোমিন, ক্লোরিন, ফ্লুয়োরিনের সঙ্গে,

পর্যাবৃত্তিক তালিকায় এদের স্থান ওর ওপরে।

পর্যাবৃত্তিক তালিকার চেহারা দেখেই মনে হয়েছিল, মৌলের মোট সংখ্যা বিরেনব্বই, শুরু হাইড্রোজেন দিয়ে আর শেষ ইউরেনিয়াম দিয়ে, তবে সেটাও খুব ঠিক নয়। মৌলনিচয়ের গঠন থেকে আরো কিছু জানা যায়। পর্যাবৃত্তিক তালিকার নিচের দিক থেকে দেখা যাক, যেখানে রয়েছে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম আর লিথিয়াম,—

মৌল	হাইড্রোজেন	হিলিয়াম	লিথিয়াম
কেন্দ্রীণ পরাবিদ্যুৎ আধান	১	২	৩
ভর	১	৪	৭

হাইড্রোজেন পরমাণুর গঠনে ঘোর-প্যাঁচ নেই বললেই হয়। পরমাণুজগতে হাইড্রোজেন পরমাণুই সরলতম। তার অতি-সূক্ষ্ম কেন্দ্রবিন্দুতে পরাতড়িৎ আধান পুঞ্জীভূত আর সেই কেন্দ্রীণেই পরমাণুর প্রায় সম্যক বস্তু-ভর নিবদ্ধ। পরাতড়িতায়িত সেই কেন্দ্রীণকে প্রদক্ষিণ করে ফেরে ইলেকট্রন কণিকা, তথা তড়িতের অপরা-আধান।

হিলিয়ামের কেন্দ্রীণে থাকে পরা-আধানযুক্ত দুটি কণা (প্রোটন) এবং দুটি অক্রিয় মৌল-কণা (নিউট্রন), তাছাড়া আরো দুটি কণা (ইলেকট্রন) তাদের প্রদক্ষিণ করে, তারা পরা-অপরা আধানের সমতা রক্ষা করে। লিথিয়ামের কেন্দ্রীণে থাকে তিনটি প্রোটন এবং চারটি নিউট্রন আর তাদের প্রদক্ষিণ করে তিনটি ইলেকট্রন। এমনি করে চলতে থাকে বিরেনব্বইটা মৌল পর্যন্ত। এবং বিরেনব্বই নম্বর, মৌলের কেন্দ্রীণে পরাবিদ্যুৎ-আধান-যুক্ত কণার সংখ্যা বিরেনব্বইটা, তাদের প্রদক্ষিণ করে বিরেনব্বইটা ইলেকট্রন। মৌলের সংখ্যা আজ ৯২ নয়, ১০৩। এর পরেও পরা-আধান যুক্ত আরো বেশি কণা সমন্বিত মৌলের সন্ধান মেলাও বিচিত্র নয়।

পরা-আধান যুক্ত বেশি বেশি কণাবিশিষ্ট মৌল, অর্থাৎ বাড়তির দিকের মৌলের না হয় খোঁজ পাবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু কমতির দিকে?

দেখা যাচ্ছে, সব কিছু নির্ভর করে পরমাণু কেন্দ্রীণের পরাবিদ্যুৎ আধানের ওপর। তাহলে যদি ভারী হাইড্রোজেনের একটি মাত্র পরাবিদ্যুৎ আধানকে সরিয়ে দিই, তাহলে পড়ে থাকবে শুধু একটা নিউট্রন। নিউট্রনের ভর ১ বলা যেতে পারে, বৈদ্যুতিক আধান বর্জিত সে একটা রাসায়নিক মৌল।

আচ্ছা, নিউট্রনের ওই ভর ১-কে যদি সরিয়ে নেওয়া হয়, বলুন তো কী থাকবে? কিছুই না। কথাটা কানে অসম্ভব শোনালেও, ব্যাপারটা কিন্তু তেমন অসম্ভব নয়। পরমাণু-পদার্থবিৎ তাঁর নানা নিরীক্ষার ব্যাখ্যা দিতে তাঁদের হিসেবের ভেতর ওই এক

ধরনের 'কিছু-না'কে ঢুকিয়ে দেন। সে 'কিছু-না'-এর নাম দেওয়া হয়েছে নিউট্রিনো। ব্যাপারটা নতুন নয়। মেন্দেলিয়েফ নিজেই হাইড্রোজেনের আগে আর একটি মৌল বসিয়ে, নাম দিয়েছিলেন কোরোনিয়াম। তাঁর বিশ্বাস ছিল, 'কোরোনিয়াম' আসে সূর্য থেকে। বিশ্বাস তাঁর ভুল নয়, সত্যিই কোরোনিয়াম সূর্য থেকে আসে। মেন্দেলিয়েফ আরো একটি মৌলের নাম করে গেছেন, মহান ইংরাজ পদার্থবিৎ নিউটনের প্রতি পরম শ্রদ্ধায়। নামটি 'নিউটোনিয়াম'। ওই নিউটোনিয়ামই বোধহয় হিসেবে নিউট্রিনোর প্রায় সমান।

বহুকাল পর্যন্ত ধারণা ছিল পর্যায়-সারণীর (periodic table) মৌলনিচয়ের আরম্ভের আগে আর কিছু বুঝি নেই। চিন্তার নবপর্যায়ে জন্ম নিয়েছে অপরাবস্তুর (antimatter) কল্পনা।

অপরাপদার্থের জটিল গবেষণায় প্রধান পুরোহিত এমিবিও জে সেগ্রে। ভদ্রলোক ১৯২৬ সালে রোমে যন্ত্রবিদ্যার পাঠ নিচ্ছিলেন। সেইখানেই তাঁর পরিচয় হয় এন্‌রিকো ফার্মি এবং তাঁর গোষ্ঠীর অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে। সাতাশ সালের সেপ্টেম্বরে সবাই মিলে কোমোয় গেলেন, পরমাণু-পদার্থবিজ্ঞান সভার অধিবেশনে, বাঘা বাঘা পরমাণুবিৎদের দর্শন করতে।

সভায় এক ভদ্রলোককে দেখে সেগ্রে সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলেন,

'ও ভদ্রলোক কে? ওই যে, খুব সাদাসিধে, অস্পষ্ট উচ্চারণ?'

'উনি বওর্‌।'

'বওর্‌? সে আবার কে?'

'সেকি, বওরের পরমাণু মডেলের কথা শোনোনি?'

'না তো, বল না, শুনি।'

সেই শুরু। সব শুনে সেগ্রের মন ঝুঁকলো পদার্থবিদ্যার দিকে। অল্প দিনের ভেতরেই বাইশ বছরের ছাত্রটি ফার্মির দলের একজন হয়ে উঠলো। বছর ঘুরতেই রোম থেকে স্নাতক উপাধি নিয়ে শুরু করলো নানা বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকায় লিখতে। কিছুদিন যেতে না যেতেই, পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক এবং পার্লেমো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা। তারপর পর্যায়-সারণীর একটি ফাঁক বোজালেন, কৃত্রিম মৌল টেকনিশিয়াম আবিষ্কার করে। ৩৮ সালে চলে গেলেন মার্কিন দেশের বাসিন্দা হতে। ওই আমেরিকায় গবেষণা করেই অপরা-পদার্থের কল্পনা তাঁর মাথায় এসেছিল।

পরমাণুর ভরকে যদি অপরিবর্তিত রাখা হয় তাহলে একটি মাত্র উপায় আছে তার

প্রকৃতি পরিবর্তন করার, সে হল তার বৈদ্যুতিক আধানকে পরিবর্তিত করে। পদার্থের ক্ষেত্রে জানি, তার পরমাণুর কেন্দ্রীণ পরাবিদ্যুৎ-আহিত। কিন্তু সেখানে যদি অপরাবিদ্যুৎ থাকে, তাহলে প্রদক্ষিণরত কণানিচয়ের আধান পরাবিদ্যুৎ হতেই হবে। পজিট্রন এবং ইলেকট্রন, তথা পরা এবং অপরাবিদ্যুতের মাত্রার অস্তিত্বের কথা জানি বলে, তাদের স্থান পরিবর্তনের কথাটাও সহজেই অনুমান করতে পারি। বাস্তবিক পক্ষে পদার্থবিদেরা এমন পরমাণু গড়েছেন, যাদের ভেতর আধানকে ঠিক এমনিভাবেই উল্টে দেওয়া হয়েছে।

মাঝে মাঝে এক-আধটা অপরাপদার্থের কণা আমরা সৃষ্টি করতে পারি বটে, তবে তার জন্যে সাইক্লোট্রন, চৌম্বক ক্ষেত্র ইত্যাদির মত বিশাল এবং জটিল ব্যাপারের যোগান দরকার। সে ক্ষেত্রে ভর একই থাকে, কিন্তু কেন্দ্রীণের আধান হয় অপরাবৈদ্যুতিক।

আধান	+১	●	-১
কণা	হাইড্রোজেন	নিউট্রন	অপরা-হাইড্রোজেন
ভর	১	১	১

এ পরীক্ষা এমন মৌল-কণা নিয়ে, যার ইলেকট্রনের আবরণ নেই, অর্থাৎ যার পরমাণু কেন্দ্রীণ 'ন্যাড়া' তাই ঠিকমত বলতে হয় প্রোটন এবং অপরা-প্রোটন। তবে, বোঝবার পক্ষে পরা-অপরা হাইড্রোজেন নাম দুটো অনেক ভালো। এ থেকে দু'একটা প্রশ্ন মাথা-চাড়া দিচ্ছে, তাহলে কি অপরা মৌলনিচয়ের একটা গোটা আলাদা পর্যাবৃত্তিক-বিন্যাস গড়ে তোলা সম্ভব? অপরাপদার্থের যৌগও কি পাওয়া সম্ভব? অপরা-মৌলে গড়া একটা অপরা-জগতেরও কি অস্তিত্ব সম্ভব?

অবিশ্বাস্যই মনে হোক, আর ভয়ে গায়ে কাঁটাই দিক, অপরাজগতের আবিষ্কার বোধহয় বেশি দূরে নয়। সত্যিসত্যিই সম্প্রতি একটা অপরা-নিউট্রন দেখা গেছে। সেটা তৈরী হয়েছিল প্রচলিত নিয়মবিরুদ্ধ পথে, তা হোক তবে জিনিসটা যে খাঁটি সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সোজা কথায় বলতে গেলে সমীকরণটি দাঁড়ায় এইরকম,

প্রোটন + অপরাপ্রোটন = নিউট্রন + অপরানিউট্রন

অতএব, নিদেন পক্ষে আমরা মৌলের আর একটা জগতের দেহরেখার কল্পনা করতে পারি। অপরা-ডিউটিরিয়ামের (অপরা-ভারী হাইড্রোজেন) পরমাণুতে তাহলে থাকবে একটা অপরাপ্রোটন এবং একটা অপরানিউট্রন। আর ইলেকট্রনের বদলে তার কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করবে একটা পজিট্রন। তেমনি অপরা-হিলিয়ামের কেন্দ্রে থাকবে

দুটো অপরাপ্রোটন আর দুটো অপরানিউট্রন, তাদের প্রদক্ষিণ করবে দুটো পজিট্রন। অপরা-মৌলের পর্যায়-সারণী গড়ে তোলা যাবে এমনি করেই।

অপরাপদার্থ সম্পর্কে আজ আর কী জানি? মূল পর্যায়সারণীর অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে এবং গঠনের প্রতিসমতা দেখে অপরাপদার্থের গুণাগুণও মোটামুটি সঠিকভাবেই বলে দিতে পারি। পদার্থের মত অপরাপদার্থও সুস্থির, তবে পদার্থের সংস্পর্শে এলেই বিপদ, সঙ্গে সঙ্গে একে অপরকে নিঃশেষে ধ্বংস করে ফেলবে। ধরুন যদি খানিকটা পদার্থ সমপরিমাণ অপরাপদার্থের সংস্পর্শে আসে, তাহলে তাদের পরস্পরের বিলুপ্তির মুহূর্তে যে পরিমাণ শক্তির সৃষ্টি হবে, একটা পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণকে তার কাছে কালীপুজোর রাতের একটা তুবড়ীর চেয়ে বেশি কিছু বলে মনে হবে না। তাই, পৃথিবীতে কোন অপরাপদার্থ আসতেও পারে না এবং এখানে তার কোন খনিও থাকতে পারে না। এমন কি, তার উচ্চ পর্যায়ের কয়েকটা পরমাণুও যে থাকবে, তারও সম্ভাবনা নেই। অতএব, রসায়নশাস্ত্রের ছাত্রদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই,— অপরাপদার্থ রসায়নশাস্ত্র তাঁদের পড়তে হবে না।

তাই বলে, মহাবিশ্বের কোথাও অপরাপদার্থের বড় রকম পরিমাণ পুঞ্জীভূত থাকবে না, এমন মনে করার কোন হেতু নেই। প্রতিসমতার প্রতি প্রকৃতিদেবীর এমনই প্রসক্তি, যে অনায়াসে বলা যায়, অপরাপদার্থের অস্তিত্ব প্রায় তর্কাতীত। অবশ্য একথাও সত্যি যে কোন অপরাবিশ্ব অথবা অপরাজগতের অস্তিত্বের প্রমাণ আজো মেলেনি। এখানে আমরা হাইড্রোজেন এবং অপরা-হাইড্রোজেনের প্রভেদ করতে পারি বটে, কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সে প্রভেদ বের করা যথেষ্ট কঠিন। আমাদের ছায়াপথে শুনি, প্রতি এক কোটি পরমাণুর স্বাভাবিক পরমাণুর-কেন্দ্রীণ আছে। এটা অনুমান। তবে, অন্য ছায়াপথে এ অনুপাত হয়তো অন্যরকম। সিগ্‌নাস-এ এবং মেসিয়ার ৮৭ আমাদের ছায়াপথের বাইরে, তাদের বিকিরণের বহর দেখে মনে হয়, সে বিকিরণের কারণ সম্ভবতঃ অপরাপদার্থের ধ্বংসজনিত শক্তি।

সমীকরণে যেমন ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক সংখ্যা একে অপরকে বাতিল করে দেয়, তেমনি গোটা বিশ্বটাই কি একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? পড়ে থাকবে শুধু— শূন্য? নতুনত্ব কিছু নেই এ চিন্তায়। এ কথার আলোচনা প্রায়ই হয়েছে, তবে, তা থেকে কিছু প্রমাণও করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এমিলিও জি সেগ্রে ব্যক্ত করেছেন এই ভাবে, বলেছেন, 'আপনারা তো বিশ্বাস করেন, ভগবান পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। ধরা যাক, তাই করেছেন, কিন্তু এমন কথা মনে করার কি কারণ আছে যে অপরাপদার্থের চেয়ে পদার্থের ওপরেই তাঁর পক্ষপাত বেশি!'

চলুন সৃষ্টির গোড়ায় কথায় যাই। দেখেছি, পদার্থ এবং অপরাপদার্থের মাঝে পূর্ণ প্রতিসাম্য বর্তমান। এখন যদি জিজ্ঞেস করি, পদার্থ এবং অপরাপদার্থের সৃষ্টি একই সঙ্গে হয়নি, একথা কে বললে? তাহলে সে প্রশ্ন নিশ্চয় অসঙ্গত হবে না। পদার্থবিদ্যার সব বইয়ে একটা ব্যাপার আছে, যাকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করা যায়। শক্তির একটি রশ্মিকে তথা একটি বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গকে বিপরীত বৈদ্যুতিক আধানযুক্ত দুটি পদার্থ কণায় রূপান্তরিত করা যায়। এই দু'টি বিপরীত বৈদ্যুতিক আধানের একটি পরা এবং অপরটি অপরাবৈদ্যুতিক। সৃষ্টির শুরুও কি ওই পদ্ধতিতে?

সি জে কিভেন একটি সৃষ্টিতত্ত্ব গড়েছিলেন, তাতে অপরাপদার্থের কথা ছিল। তিনি বলেছিলেন, সৃষ্টির মুহূর্তে পদার্থ এবং অপরাপদার্থ যুক্ত ছিল, তারা 'ভিন্ন' হয়েছে পরে, অভিকর্ষ-'অপরাভিকর্ষের (gravity-antigravity) পারস্পরিক বিপ্রকর্ষের কারণে। 'অপরাভিকর্ষের' ধারণাটা এতই নতুন যে আমাদের জগৎ-চিন্তায় তাকে খাপ খাওয়ানো নিতান্তই কঠিন ব্যাপার। তবে এ শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাসী কিভেনই একমাত্র ব্যক্তি নন।

জর্জ গ্রামোভও ওই রকম ধারণা পোষণ করেন। তিনি বলেছেন, অভিকর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে অপরা-কণার ভর পরা-আধান সমন্বিত কিনা, তা এখনো প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু তার ভর যদি অপরা-আধান সমন্বিত হয়, তাহলে তো অপরা-আপেলটি মাটিতে না পড়ে আকাশে 'পড়বে'।

অপরাপদার্থ সমন্বিত মহাবিশ্বের একটা নতুন ধারণা যদি দানা বাঁধে এবং সাম্প্রতিক কিছু অনুপপত্তির অপসারণ ঘটে, তাহলে এক বিশালতর বিশ্বের সঙ্গে মানুষের সেই নতুন সম্পর্কের দরুন তাকে নবতর সমস্যার মুখোমুখি দাঁড় করাবে।

প্রায়ই ভুলে যাই, আমাদের গোটা সৌরমণ্ডলটা একটি মাত্র ছায়াপথের একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ। ভুলে যাই, আমাদের ছায়াপথটি অনন্ত মহাবিশ্বের কোটি কোটি আরো ছায়াপথের মাঝে একটি মহাজাগতিক অস্তিত্ব মাত্র। যদি আবার এর ওপর একটি অপরা-ব্রহ্মাণ্ড থেকে থাকে, তাহলে আমাদের পৃথিবীর 'প্রাধান্য' তো আরো একধাপ নেবে যাবে। নিজেদের আমরা বড্ড বেশি বড় ভাবি, কিন্তু সত্যি আমরা কতটুকু! একথা ভাবতেও যে লজ্জায়, ঘৃণায়, ভয়ে কুঁকড়ে যাই! তবে একটা বিষয়ে নিশ্চিন্দি, পরা এবং অপরা, দুটো ব্রহ্মাণ্ডের সংঘাতে যদি কোনদিন দুটোই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাহলে আমাদের দেহ-মনে আর কতটুকু ব্যথা বাজবে।

এফ এল বর্শকির 'সৃষ্টি আজও বিরামহীন' অবলম্বনে।

কাল-শ্লথন

বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, অত্যুচ্চ বেগে আন্তর্নাক্ষত্র পথে যাত্রাকালে সময় কাজ করে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির কাল-মান অনুযায়ী। যে-মহাকাশযান ছুটে চলেছে প্রায় আলোর গতিতে, তার ভেতর সময় পা ফেলে নেহাতই শম্বুক গতিতে,— যে-গ্রহ ছেড়ে সে বেরিয়েছে, তার সময় কিন্তু চলছে, তার তুলনায় বিদ্যুৎবেগে। কালের এ-রূপান্তর ঘটায় গতি এবং শক্তি।

কাল-প্রসারণের তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে আমাদেরই কালে, আইনস্টাইনের হাতে। কিন্তু সে-তত্ত্ব প্রকৃতির ঘরের মাল-মসলায় গড়া বলে সর্বকালে তা সিদ্ধ। যদি কোন মহাকাশযানকে একটানা ১Gতে চালানো হয় (G=Gravitational constant, তথা মহাকর্ষাঙ্ক =9.18 m/Sec^2) এবং যাত্রার মধ্য পথে যদি -১G (বিযুক্ত ১G) দিয়ে তার গতি রোধ করা হয়, তাহলে সেই মহাকাশযান এবং ছেড়ে-যাওয়া-গ্রহের মাঝে কাল-প্রসারণের দরুন কালের এই ধরনের তফাত ঘটবেই—

মহাকাশযানের ভেতর কাটা বছর	যে-গ্রহের ওই মহাকাশযান, যেখানে কাটা বছর
১	১.০
২	২.১
৫	৬.৫
১০	২৪
১৫	৮০
২০	২৭০
২৫	৯১০
৩০	৩,১০০
৩৫	১০,৬০০
৪০	৩৬,০০০
৪৫	১,২১,০০০
৫০	৪,২০,০০০

(এ তালিকা মেয়ারের Handbook on Space নামের বই থেকে নেওয়া।)

কাল-প্রসারণের ব্যাপারটা আবিষ্কৃত হয়েছে আমাদেরই কালে, অথচ তার ক্রিয়া-কলাপের হদিস মেলে প্রাচীন পৃথিবী জুড়ে!

একটা গপ্পো বলি, শুনুন। বাইবেলের গপ্পো।

এ গল্পটা 'পুরাতন নিয়মের' অপ্রামাণিক (Apocrypha) গ্রন্থ 'The Remaining Words of Baruch'-এর অন্তর্গত। জেরেমাইয়ার কালে বারুক ছিলেন একজন লিপিকার। 'জেরেমাইয়ার পুঁথি'তে (Book of Jeremia) তাঁর কথা অনেকবার আছে।

সব ঋষিদের মত জেরেমাইয়ারও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সঙ্গে একটু বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ঈশ্বর তাঁকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, জেরুসালেমকে জয় করে নেওয়া হবে এবং সমস্ত বিশিষ্ট লোকদের বেবিলনে নির্বাসিত করা হবে। ঝঞ্ঝাটের কাল ঘনিয়ে আসতে জেরেমাইয়া ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা করে বললেন,—

"এই ছেলেটি আমার তরুণ বন্ধু। আবিমেলেক এর নাম, বাড়ি আবিসিনিয়ায়। দু'দু'বার এ আমার জীবন রক্ষে করেছে। এ নগর যে পাপ করেছে, সে-পাপে ও কোনভাবেই পাপী নয়। তাই আমার একান্ত অনুরোধ, বেবিলনীদের মারের আওতা থেকে ওকে আপনি বাঁচান।"

ঈশ্বর জেরেমাইয়ার অনুরোধ রাখলেন। বললেন, "কাল ভোরে তাকে একটা চুপড়ি দিয়ে, এক চুপড়ি তাজা ডুমুর পেড়ে আনতে পাঠাও, তবে সে যেন আগ্রিপার আঙুর ক্ষেতের ভেতর দিয়ে ঘুর পথে যায়।"

তাঁর কথা মত জেরেমাইয়া তাঁর তরুণ বন্ধুকে পরের দিন সকালে ডুমুর আনতে পাঠালেন। আবিমেলেক একটা সরু পায়ে-চলা পথ ধরে আগ্রিপার আঙুর ক্ষেতের ভেতর দিয়ে গিয়ে এক চুপড়ি তাজা তাজা ডুমুর তুললেন। চুপড়ি ভরতি হতে ফেরার পথ ধরলেন। কিন্তু হঠাৎ কেমন মাথাটা ঘুরে যেতে পড়ে গেলেন। পরে তাঁর মনে হয়েছে, তিনি বুঝি গভীর ঘুমে লুটিয়ে পড়েছিলেন। যখন ঘুম ভাঙলো, দেখলেন, সূর্য অনেক পথ এগিয়ে গেছে। বুঝলেন, প্রায় দু'ঘণ্টা ঘুমিয়েছেন। জেরেমাইয়ার তিরস্কারের ভয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে জেরুসালেম ফিরে চললেন।

কিন্তু জেরুসালেমে ফিরে, একটা লোককেও তিনি চিনতে পারলেন না। যে বাড়িতে জেরেমাইয়া, তিনি আর বারুক থাকতেন, সে বাড়িতে ঢুকলেন, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। রাস্তায়ও সব অচেনা লোকের ভিড়। হতবুদ্ধির মত হাঁটতে হাঁটতে নগরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। কী হল, তার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?

জায়গাটা সত্যি জেরুসালেম তো? নাকি, অন্য কোথাও এসে পড়েছেন? আবার একবার ঢুকলেন নগরের ভেতরে। না, সবই তো সেইরকম, এ জায়গা জেরুসালেম না হয়ে যায় না। কিন্তু একটা লোককেও চিনতে পারছেন না কেন? আরো কয়েকটা জিনিস বদলেছে। নগরের তোরণ বদলেছে, যে নিশানগুলো পত পত করে উড়ছে, সেগুলোও চেনা লাগছে না।

আবার একবার তিনি নগর প্রাকারের বাইরে গিয়ে নগরের দিকে ফিরে চাইলেন। কী আশ্চর্য, সত্যিই কি তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেল? সেই একটুখানি ঘুমিয়েই সব গোলমাল হয়ে গেল? এ নগর যে জেরুসালেম, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আবার তিনি নগরে ঢুকলেন।

এবারেও পরিচিত কাউকে দেখতে পেলেন না। মন-মরা হয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা কুয়োর ধারে গিয়ে দেখলেন শ্মশ্রুল এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আবিমেলেক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন,

"আচ্ছা এটা কোন জায়গা? কী নাম এখানকার?"

বৃদ্ধ বললেন, "এ জায়গার নাম জেরুসালেম।"

আবিমেলেক বললেন, "কিছু যদি মনে না করেন তো বলি, এ নগরের নাম বোধহয় জেরুসালেম নয়, কেননা জেরুসালেম আমার খুবই চেনা।" তারপর তিনি তাঁর ডুমুর তুলে আনার কথা বললেন।

ঋষি জেরেমাইয়া আর বারুকের নাম করতে বৃদ্ধ বললেন,

"ভায়া, তোমাকে নিশ্চয় ঈশ্বর রক্ষে করেছেন। শুধু বারুক জেরেমাইয়া নয়, আরো সকলকে কোমরে দড়ি বেঁধে বেবিলনে নিয়ে গেছে, কিন্তু সে তো ছেষট্টি বছর আগেকার কথা!"

আবিমেলেক হাসতে হাসতে বললেন, "মাথাটা বোধহয় সত্যি আপনারই খারাপ হয়ে গেছে। আমি মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে জেরুসালেম থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলুম, তাজা ডুমুর তুলে আনবার জন্যে। তারপর চুপড়ির ঢাকা খুলে, ডুমুর বের করে বললেন, "এই দেখুন সেই ডুমুর, বলুন, এগুলো কি অল্পক্ষণ আগেই তোলা নয়?"

বৃদ্ধ আরো বিস্মিত। বললেন, "না, বন্ধু, মাঠের দিকে চেয়ে দেখো, ডুমুরের সময় এটা নয়, আরো কয়েক মাস না গেলে ডুমুর পাকবে না।"

চার-ছ' ঘণ্টায় ছেষট্টিটা বছর পার হয়ে গেল! এতকাল আমরা ভাবতুম, এ বুঝি শুধু গল্প, রূপকথা।

পশ্চিমের গল্প শুনলেন, এবার পূবের গল্প শুনুন। এ গল্পটা শুনিয়েছেন দানিকেন। তাঁর কাছে আমার এসব গল্প শোনা, কোলকাতার গ্র্যাণ্ড হোটেলে বসে? তারপর আমি শুনিয়েছিলুম তার ভারতীয় 'সংস্করণ'। সে-গল্প পরে শোনাচ্ছি।

জাপানের জোসা জেলার এক জায়গার নাম হেকি। সেখানকার এক গ্রামের নাম ৎস্যুৎসুকাহা। সেই গ্রামেরই এক জেলের ছেলে 'দ্বৈপায়ন'। ছেলেটি দেখতে শুনতেও ভালো, কাজেও খুব ওস্তাদ।

দেশের রাজা তখন থাকেন আসাকুরার রাজপ্রাসাদে। সেখান থেকেই করেন রাজ্য শাসন। তাঁরই প্রজা দ্বৈপায়ন একদিন একলা বেরিয়ে পড়লো নৌকো নিয়ে মাছ ধরতে। মাছ সেদিন একটাও ধরা পড়লো না। দাঁড় বেয়ে আর জাল টেনে টেনে ক্লান্ত হয়ে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লে বেচারা। তারপর হঠাৎ নৌকোয় একটা দোলা লাগতে তার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলে দেখে, আশ্চর্যি, তার সামনে বসে রয়েছে অপরূপ এক রূপবতী কন্যে। প্রায় আঁতকে উঠে সে শুধোয় "কে তুমি? মানুষের ঘর দোর তো এখান থেকে অনেক দূরে। এখানেও তো আর কোন নৌকো নেই, কোন মানুষও নেই। কোথা থেকে এলে তুমি কন্যে? কেমন করে এলে?"

কন্যে হেসে বললে, "আকাশ থেকে!"

'আকাশ থেকে? সে আবার কেমন কথা। বল না সত্যি করে, কোত্থেকে তুমি এলে? কেমন করেই বা এলে?"

মেয়ে বললে, সত্যি কথাই বলছি, আমি এসেছি স্বর্গ থেকে। সন্দেহ কেন? আমায় দেখতে ভালো নয়? আমাকে একটু ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে না, আদর করতে ইচ্ছে করছে না বুকে নিয়ে। যত দিন স্বর্গ আছে, মর্তও যত দিন থাকবে, ততদিন আমি থাকতে চাই তোমার কাছে, তোমার কোলে। যদি আমাকে বিশ্বাস কর, তাহলে একটু চোখ বুজে থাকো, তারপর সব দেখতে পাবে, সব বুঝতে পারবে।"

দ্বৈপায়ন কী বুঝলো, কে জানে, তবু সে চোখ বুজলো। তারপর যখন সে চোখ মেললো, তখন দেখে, সে গিয়ে পৌঁছেছে আশ্চর্য এক দ্বীপে। পথে পথে তার মণি-মুক্তো ছড়ানো। এমন সুন্দর জায়গা সে কখনো দেখেনি জীবনে। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে নজরে পড়লো, ঝকঝকে এক প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসছে সাতটি মেয়ে। তাদের নাম সপ্তকন্যা কৃত্তিকা (Pleiades), তারপর এলো আরো আটজন, তাদের নাম রোহিণী (Hyades)।

কন্যের বাপ-মায়ের সঙ্গেও দ্বৈপায়নের আলাপ হল। তাঁদের কাছে শুনলো, স্বর্গের সঙ্গে মর্তের তফাত কোন্‌খানে, আরো অমন কত কথা শুনলো তাঁদের কাছে

বসে। তারপর এক শুভ দিনে দ্বৈপায়ন আর কুমারীর মালা-বদল হয়ে গেল। শুরু হল তাদের নিবিড় সুখের দিন। পৃথিবীর তুলনায় সীমাহীন সে-সুখ। পুরো তিনটে বছর কেটে গেল দেখতে দেখতে।

একদিন বেড়াতে বেড়াতে কী জানি কেন, হঠাৎ তার মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। —'সত্যিই তো কত দিন মাকে দেখিনি। কত কান্নাকাটি করছে মা, একলা বসে বসে।'— বড় মন খারাপ হয়ে গেল তার। কন্যে বললে, "কী হল গো, কথা বলছো না কেন? তোমার চোখই বা ছলছল করছে কেন? কিসের কষ্ট তোমার, আমায় বল!

দ্বৈপায়ন বললে, "তুমি আমায় কত সুখে রেখেছো। এত সুখ আমার মত মানুষের কপালে যে কেমন করে জুটলো, বুঝতে পারি না। এত সুখে আছি বলেই বোধ হয় আজ বাড়ির কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, আমার দুঃখিনী মায়ের কথা, চোখ বোধহয় তার সারাক্ষণই ভিজে।—লক্ষ্মীটি, তুমি একবার আমার মাকে দেখে আসার ব্যবস্থা করে দাও। একবার মাকে দেখেই আমি তোমার কাছে চলে আসবো, তোমাকে ছেড়েও আমি থাকতে পারবো না।

তারপর স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে, 'স্বর্গ' থেকে বিদেয় নিয়ে চেপে বসলো জাহাজে। স্ত্রীর অনুরোধে চোখ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই যেন সে পৌঁছে গেল ৎস্যুৎসুকাহা গ্রামে একেবারে তার বাড়ির দোর গোড়ায়। কিন্তু এ কোথায় এলো সে? কিচ্ছুই যে চিনতে পারছে না। সে কি ভুল জায়গায় এসে পড়লো? তবু, এক বৃদ্ধকে দেখতে পেয়ে শুধোয়, "আচ্ছা, এটা কি ৎস্যুৎসুকাহা গ্রাম,?" বৃদ্ধ বললেন, "হ্যাঁ, গো বাছা, এইটেই ৎস্যুৎসুকাহা গ্রাম। কার বাড়ি খুঁজছো তুমি?" দ্বৈপায়ন বললে, "আমি যেতে চাই দ্বৈপায়নদের বাড়ি, সেটা কোনখানে?" বৃদ্ধ তার মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে বললেন, "কোথাকার মানুষ তুমি বাছা, যে অমন দূর কালের মানুষদের কথা জিজ্ঞেস করছো? বুড়ো-বুড়িদের মুখে শুনেছি, এক কালে এখানে একটা খুব সুন্দর জোয়ান ছেলে ছিল, তাদের বাড়ি ছিল ওই পোড়ো জায়গাটার কাছে। সে একদিন মাছ ধরতে গিয়ে আর ফিরে এলো না। তার বুড়ি মা দুঃখে, কষ্টে, চোখের জল ফেলতে ফেলতে মাটি নিলো। কিন্তু সে তো অনেক কাল আগের কথা, তা প্রায় তিনশো বছর হবে! এত কাল পরে তুমি তাদের খোঁজ করছো কেন?

দ্বৈপায়ন অবাক। যেন বোবা হয়ে গেল সে। কী আর করবে, ব্যথাতুর মন নিয়ে, চোখের জল ফেলতে ফেলতে ঘুরে বেড়াতে লাগলো হেথা-হোথা-সেথা।

রূপকথার প্রেমের ওই গল্পটিতেও লুকিয়ে রয়েছে সেই কালপ্রসারণের কথা। এবারে শুনুন, অমন গল্পের একটি ভারতীয় 'সংস্করণ'। এ কাহিনী বিষ্ণুপুরাণের।

রৈবত ছিলেন কুশস্থলীর রাজা। তাঁর এক মেয়ে ছিল অপরূপ রূপবতী। রেবতী তাঁর নাম। অত রূপ, কিন্তু তার উপযুক্ত বর কোথায়? রাজা অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন, কিন্তু কোথাও তেমন মনে-ধরা গোছের বর দেখতে পেলেন না। শেষকালে ঠিক করলেন, ব্রহ্মার কাছে গিয়ে তাঁর পরামর্শ নেবেন।

তাই একদিন বেরিয়ে পড়লেন মেয়েকে নিয়ে। উদ্দেশ্যে, ব্রহ্মার দয়া ভিক্ষে।

যখন গিয়ে পৌঁছোলেন, তখন গান্ধর্ব গায়ক হাহা আর হূহু তাঁকে গান শোনাচ্ছেন। মেয়েকে নিয়ে রৈবতও সেখানে বসে স্বর্গীয় সঙ্গীত রস পান করতে লাগলেন।

গান থামতে শ্রোতারা সব গায়কদের সঙ্গে বিদেয় নিলেন। সকন্যা রৈবতকে দেখে ব্রহ্মা তাঁদের কুশল প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন, তাঁদের ব্রহ্মালোকে আসার উদ্দেশ্যের কথা। রৈবত তখন আনুপূর্বিক সব বললেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দেওয়া যায়।

সব শুনে ব্রহ্মা একটু মুচকে হাসলেন, তারপর বললেন, "তুমি যাদের কথা বললে, ফিরে গিয়ে তাদের কাউকে আর দেখতে পাবে না। তুমি যতক্ষণ এখানে বসে আছো ততক্ষণে পৃথিবীতে বহু চতুর্যুগ অতীত হয়ে গেছে এবং তুমি যখন আবার তোমার রাজ্যে পৌঁছোবে তখন দেখবে পৃথিবীতে অষ্টবিংশতি-তম মন্বন্তরের দ্বাপর যুগ চলছে। তোমার বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়-স্বজন-পুত্র-কলত্র কেউই তখন থাকবে না।"

রৈবতের অবস্থা, সে কথা শুনে তো শোচনীয়। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করলেন, "এমনই যখন অবস্থা, তখন কাকে আমার কন্যা দান করবো?"

ব্রহ্মা বললেন, "রাজা, আগে যেখানে তোমার কুশস্থলী রাজ্য ছিল, এখন সেখানে দ্বারকানগরী। দেখবে, বলরাম সেখানে রাজত্ব করছেন, সেই বলরামকেই তুমি কন্যা দান কোরো। তিনিই তোমার কন্যার উপযুক্ত বর"।

ব্যথাতুর মন নিয়ে রৈবত ব্রহ্মাকে প্রণাম করে পৃথিবীতে ফিরে এলেন। কিন্তু এ কোন্ পৃথিবী? তাঁর কালের কিছুই যে কোথাও নেই। তাঁর বংশ তো লুপ্ত হয়ে গেছেই, মানুষগুলোও সব বেঁটে হয়ে গেছে, শক্তি-সামর্থ তাদের যৎসামান্য। কী আর করবেন, সংকর্ষণের হাতেই তিনি তার কন্যা সমর্পণ করলেন।

আজ আমরা আইনস্টাইনের দৌলতে কাল-প্রসারণের কথা জেনে খুঁজে পেয়েছি এ সব কাহিনীর প্রকৃত অর্থ। কিন্তু এই সূত্রে শুধোই ডারউইনের বিবর্তনসম্ভূত এই সেদিনকার মানুষ কোথায় পেলো, কবে পেলো এমন জ্ঞানের আলো?